প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, পটভূমিকা ও পূর্বসূত্র	পৃঃ- ১-৪২
ক. আধুনিকতার সংজ্ঞা	পৃঃ- ১
খ. ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার	পৃঃ- ১০
গ. রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট	পৃঃ- ২৭
পূর্ব সূত্র	পৃঃ- ৩১

ক. আধুনিকতার সংজ্ঞা

আমাদের আলোচনার মূল বিষয় — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি' নামক পত্রিকাটির ভূমিকা পর্যালোচনা। স্বভাবতই পূর্বাহ্নেই আমাদের স্থির করে নিতে হবে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা কোন্ বিশিষ্টতাটিকে নির্দেশ করতে চেয়েছি এবং বাংলা সাহিত্যের কোন্ কাল-পর্বটিকে অবলম্বন করতে চেয়েছি। বলা বাহুল্য যে সাহিত্যে 'আধুনিকতা' শব্দটি খুবই জটিল ও বিতর্কিত প্রশ্ন এবং সেটি আপেক্ষিকও বটে। আধুনিকতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ যুগে যুগে পাল্টেছে এবং তার জন্মমুহূর্তটিকেও সঠিক কোন সময়ে নির্ধারিত করা সম্ভব নয়। আমরা প্রথমে আধুনিকতা সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে সূত্রাকারে স্মরণ করে নেবো।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিকতার সূচনার কথা প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল ষোড়শ শতকের চৈতন্য-প্রভাবিত যুগ সম্পর্কে। ঐতিহাসিক বলেছিলেন — "ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালীর জীবনে এক অপূর্ব প্রেরণা আসে। তাহারই প্রতিচ্ছায়া সাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে সার্বজনীন সাহিত্যের পথে দাঁড় করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালী ঘরের কোণ ছাড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিপথে দাঁড়াইল।"[1] বলা বাহুল্য চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উদার ও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবতা-বাদের স্বীকৃতি[illegible] দেব-নির্ভর, ধর্ম-সম্পর্কিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিকতার চেতনা' বলে সঠিক ভাবেই চিহ্নিত হয়েছিল। এর পরেও একবার মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আধুনিকতার কথা উঠেছিল। ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্য করেছিলেন — "আধুনিক কালের হাওয়া বহিতে শুরু হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের কাব্যে ধর্মের গোঁড়ামীর প্রতি কটাক্ষ আধুনিক মনোভাবের একটি চিহ্ন।"[2] অর্থাৎ কেবল মানবিকতা-বোধই নয়, সাধারণ মানুষ ধর্মের সংস্কারকে অস্বীকার করে এই সময়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল, পারিপার্শ্বিক চিত্র কেবল পটভূমিকা না থেকে মানব-সম্পর্কযুক্ত

হয়ে প্রাধান্য পেতে লাগল, দেবতার দৃষ্টি দিয়ে নয়, এমন কি দেবকল্প মানুষের আদর্শেও নয়,— ধূলি-মলিন মর্তের মানুষ তার ভাল-মন্দ, সবটুকু নিয়েই প্রধান হয়ে উঠল । কেবল ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদই নয়,- কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ্ আখড়াই, তর্জা প্রভৃতি লোক সাহিত্যের ধারায় সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি পেল । ঐতিহাসিকেরা সঠিকভাবেই বলে-ছিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্য থেকে মধ্যযুগের নানা খাতে বয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য সুস্পষ্ট কিন্তু ধীর গতিতে আধুনিকতার পথে বিবর্তিত ও অগ্রসর হয়েছিল । মধ্য-যুগীয় সংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক চেতনা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত-মানস ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলছিল ।

এতৎসত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলে মেনে নিতে পারিনি । আধুনিকতার সংকেত বলতে আমরা বুঝেছিলাম—

"New literary types, reform of the language, social re-construction, political aspirations, religious movements, and even changes in manners that originated in Bengal, passed like ripples from a central eddy, across provincial barriers to the furthest corners of India ".[৩]

এটি সম্ভব হয়েছিল ঊনিশ শতকে, যখন —

"on 23rd. June 1857 the middle age of India ended and her modern age began." [৪]

আধুনিক কালের সমালোচকেরাও প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন —"প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার প্রস্থানভূমির পার্থক্য যদি এক কথায় বলতে হয়, এইটুক্ বললেই পর্যাপ্ত হবে, প্রাচীন কাব্যের মূল সূত্র রচয়িতার আত্মবিলুপ্তি এবং পরবর্তী কবিতার উপপাদ্য অভিমানী অহং। এই ভেদ সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় আধুনিকতার চরিত্র ও মাত্রা সংক্রান্ত আলোচনায় যদি মধুসূদন-পূর্ব অধ্যায় প্রবেশাধিকার চায়, তাহলে স্তম্ভিত হওয়ার কিছু নেই ।"[৫] প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার লক্ষণ ও চেতনা যুগ বিশেষে পরিবর্তিত হলেও তা যে ইতিহাসের বিবর্তনের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়, সে সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় । এবং তারই ফলে ঊনিশ শতকের সাহিত্যের বিশিষ্টতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

আত্মপ্রসার, সমাজ, দেশ ও ইতিহাসচেতনা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটে উঠেছিল । সব থেকে বড় কথা ছিল —

> "The English brought prose into Bengal, and when rhyme gave place to reason, our literature entered into its modern phase." [৬]

বস্তুতঃ ইংরেজ শাসন ও খ্রীস্টান মিশনারীরা এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা, মুদ্রণযন্ত্র, সাময়িক-পত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জাতির জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং তার ফসল হিসাবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কার-আন্দোলন ও সাহিত্য-সাধনায় আমাদের দেশে সত্যকার আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল । এই আধুনিকতার মূল স্বরূপ ছিল মনুষ্যত্ব-বোধের বিকাশ, সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, সমাজ ও দেশ-কল্যাণে উদারতর ও মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠা । বাংলার সাহিত্য ও বাঙালীর জীবন এই সময়ে কেবল গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গেই সুসঙ্গতি লাভ করেনি, সমগ্র ইউরোপের নবজীবনের উচ্ছ্বাসে একই স্রোতধারায় মিশে গিয়েছিল । বিশেষ করে সাহিত্যের বক্তব্য, আবেদন ও প্রকাশ-রীতির নিত্য-নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নবরূপায়ণ, তার বহু বিচিত্রতা, মৌলিকতা ও বিশিষ্ট ধর্ম আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য থেকে তাকে সুস্পষ্টরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে চিনিয়ে দিয়েছে । সাহিত্য হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের সর্বপ্রকার মানসচর্চার উপযুক্ত মাধ্যম, যুগ-জীবনের দর্পণ ।

কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকে না, সে যত বড় ঐশ্বর্যের ধারকই হোক না কেন । মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যও এগিয়ে চলে । ফলে —"ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় যে যন্ত্র-বিপ্লব ঘটেছিল, তার ফলে মানুষের সাহিত্য-শিল্পের মোড় একবার ঘুরেছিল । তারপর সারা শতাব্দী ধরে তার অগ্রগতি ছিল অব্যাহত । কিন্তু সে অগ্রগতি প্রথম ধাক্কা খেল এসে বিংশ শতাব্দীতে ।"[৭] আলোচকেরা লক্ষ্য করেছিলেন —"ঊনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রভাব আমাদের দেশে খণ্ডিত রূপেই সত্য ছিল । দীর্ঘ দিনের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সহজাত ভাব-প্রবণ দৃষ্টি, যুক্তি ও বুদ্ধির উজ্জ্বল পথে প্রসারিত হয় নি তেমন ভাবে । অকারণ অতিরিক্ত আবেগের কুয়াশা তখনও আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছিল । ঊনিশ শতকের অন্যতম যুগলক্ষণ

মানব-প্রত্যয় হলেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখনো পর্যন্ত। ... তার জন্য আমাদের দিন গুনতে হয়েছে বিশ শতকের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়।"[৮] ডঃ সুকুমার সেন লিখেছিলেন —"বিশ শতাব্দে বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনতার প্রবেশ রবীন্দ্র-সাধনার বজ্রসূচী পথে, আর সে নবীনতার নবনবায়মান বিকাশ ও পরিণতি রবীন্দ্র-শিল্পে।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হলেও বিশ শতকীয় সাহিত্যাদর্শের লক্ষণ তাঁর সুবিপুল সাহিত্য-ধারায় পরিস্ফুট। একদিকে তিনি যেমন বঙ্কিম-প্রবর্তিত সমাজ-কল্যাণের আদর্শকে আধুনিক যুগজীবনের জটিল সমস্যায় রূপায়িত করেছিলেন, তেমনি কাব্য-ধারায় মধুসূদনের ব্যক্তিত্ববোধক আদর্শ ছেড়ে বিহারীলালের মন্ময়তার পথে নব্য লিরিক প্রবণতাকে অবিশ্বাস্য রকমে মূর্ত করে তুলেছিলেন এবং তার মধ্যে অতিন্দ্রীয়তার মূর্চ্ছনা এনে রাবীন্দ্রিক বিশিষ্টতার এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। উনিশ শতকের সমন্বয়ী মানসিকতা ও সুস্থ নীতিবোধকে অস্বীকার না করেও তাকে মানুষের স্বভাব-ধর্মের পথে স্বাধীন বিহার করতে দিয়েছিলেন। কি বিষয়-বিন্যাস, কি ভাষা-রীতি — সমস্ত দিকেই তিনি নতুন নতুন সম্ভাবনার ও সার্থকতার নিদর্শন দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় রসরূপই সৃষ্টি করলেন না, সাহিত্যকে আধুনিক জীবনের সকল বিশ্বাস, সকল সন্দেহ, সকল জটিলতায় আশ্চর্যরকমে মূর্ত করেই তুললেন না, রবীন্দ্রনাথের পরও যে নতুন সুর পাওয়া সম্ভব — তাও দেখিয়ে দিলেন। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছিলেন —"বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের বীজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল।"[১০] আধুনিক সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি বুদ্ধদেব বসুও স্বীকার করেছিলেন —"রবীন্দ্রনাথের পর নতুন সুর রবীন্দ্রনাথেই।"[১১] প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন উপলক্ষ-জাত ঘটনাবলীর প্রতিফলনই কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পড়েনি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ও সত্য পথের সন্ধানই কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্য নির্দেশ করেনি, সাহিত্য-চর্চার প্রতিটি বিভাগে প্রচলিত ও নতুন রূপ ও রীতির আদর্শ সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে কেবল আধুনিক পরিচয় নয়, নিত্য-সত্যের শিল্পিত রূপ সৃষ্টি করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকেও মুক্ত হবার জন্য আধুনিক লেখকেরা যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ

হয়েছিলেন বলেই নয়, বরং তার উল্টো — তিনি বড় বেশি আধুনিক মননকে গ্রাস করে রেখেছিলেন। "একে তো রবীন্দ্রনাথ "তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে বসে ভোগ করা যায়। তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মত, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে পদে। ... তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। ... আমাদের পরম ভাগ্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের, দিতে হচ্ছে। ... রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিল যে তার বিস্ময়-জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু'তিন দশক কেটে গেল বাংলা দেশের।"[১২] রবীন্দ্রনাথ "বাংলা দেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো ছিলেন", এটা যেমন বাস্তব সত্য ছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু গুমরানো অসন্তোষও এই সময়ে জেগেছিল। সেই অসন্তোষ এসেছিল যুগেরই প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভায় বিশ শতকীয় নানা প্রভাব ধরা পড়লেও, এই সময়ে এমন কতকগুলো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, যার স্পর্শ রবীন্দ্র-সাহিত্যে লাগলেও যা রবীন্দ্র-মানসের অনুকূল ছিল না। বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, নীতি ও মূল্যবোধের যে বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছিল গোটা পৃথিবীতেই, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায় না। মানবতায় বিশ্বাসী মহাকবি যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু বিকৃত ও পঙ্গু ধ্যান-ধারণাকে বরং তিরস্কৃতই করেছিলেন। 'বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীর আত্মতায়' তিনি তখনও মগ্ন, সাহিত্য তাঁর কাছে বিশুদ্ধ আনন্দের উপকরণ, মুক্ত বিহার। যুগের দাবি প্রবল হয়ে উঠল সাহিত্যের অঙ্গনে। সুতরাং "এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে অভাব-বোধ জেগে উঠলো। ... মনে হল, তাঁর কাব্যে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রনার চিত্র। মনে হল, তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। ... প্রয়োজন ছিল এই বিদ্রোহের — বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য করে পাবার জন্য।"[১৩] অর্থাৎ বিশ শতকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিতে যেমন আধুনিকতার নতুন রূপ জেগে উঠেছিল, তেমনি এই শতকের তৃতীয় দশক থেকেই আভাসিত হতে লাগল আধুনিকতার আর এক সুর। শেষ পর্যায়ের 'ভারতী' পত্রিকায় এই সুর-ধর্মের ধমড়া দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রানুসারী কবি-গোষ্ঠীর মধ্যেও এই নতুন ধ্যান-ধারণা উঁকি দিতে আরম্ভ করেছিল, বিশেষ করে মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে, 'সবুজপত্র' পত্রিকা এই যুগ-মানসটিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু আসলে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর চেতনাতেই স্পষ্ট ধরা পড়ল "প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বাংলা দেশের মোড় ফেরার কাল-টি, জীবনচর্চায় ও মানসিকতা — উভয় ক্ষেত্রেই",[১৪] বর্তমান-অর্থে আধুনিকতার লক্ষণ এই সময় থেকেই ধরা হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের আধুনিকতা বলতে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যের লক্ষণগুলিকেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই সাহিত্যের জন্ম সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ থেকে। অবশ্য উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যও সেকালের ইংরাজী সাহিত্যের রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের প্রত্যক্ষ জীবন-রসে পুষ্ট ছিল। "কিন্তু সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক না কেন, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন" ছিল।[১৫] কিন্তু ইতিমধ্যে সেই দেশের সাহিত্যেও 'হাওয়া বদল' ঘটেছিল, বিশ্বাস ও গঠনমূলক মানসভঙ্গিতে দেখা দিয়েছিল সংশয়, অবিশ্বাস, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে আমদানী করা হয়েছিল ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। আমাদের দেশের সেই সময়ের পরিমন্ডলে যুদ্ধোত্তরকালীন অনিবার্য ভাঙন এমন সর্বব্যাপী হয়ে দেখা না দিলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তাতে তরুণ বাঙালীর বিষাদ-চেতনা, ভাঙনের নেশা সে যুগের কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করে তার আকর্ষণে সাড়া দিতে চেয়েছিল। ইবসেন, মেটার লিঙ্ক, স্ট্রীন্ডবার্গ, ফ্লবেয়ার, জোলা, গোর্কি, শেখভ্, তুর্গেনিভ্, লিনানৃক্তি, বোয়ার, ক্নুট হামসুন, হাক্সলি, স্পেন্ডার, এলিয়ট, লরেন্স্ — প্রভৃতি ইওরোপীয় সাহিত্যের ঝাঁঝালো স্বাদে সেদিনের তরুণ বাঙালী-লেখক কেবল অভিভূতই হয়নি, তাঁদের বাংলা সংস্করণে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিল। আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের উপকরণ-সংগ্রহ, বিষয়-বিন্যাস, রচনা-রীতি, আঙ্গিক-কৌশল, ভাষা, উপমা-প্রয়োগ সমস্ত ক্ষেত্রেই, এমন কি সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিতে এ কালের বিশ্বসাহিত্যের খোঁজ তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। আধুনিক লেখক অবশ্য বলেন —

> "All our talk of similarities between contemporary authors is, after all, superficial and arbitrary, admitted for the sake of mere convenience, for no two authors, though, initially belonging to the same movement or the same historical group, think feel or write in the same way."[১৬]

এই বিতর্কটিকে উপেক্ষা করলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনে ও সৃষ্টিতে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের অনিবার্য উপস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের, এমন কি বিশ শতকের রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বে সমরোত্তীর্ণ তৃতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে নতুন সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যেকার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন — "ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজী কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল । তখনকার কালে সেইটেই হোল আধুনিকতা । কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা । ... সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অনাবৃত । ... কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল ঊনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা । এই জন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয় । অলঙ্কারের উপর নয় ।" আর সেই কারণেই তিনি সময়-কালের চেয়ে মানস-ধর্মের ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন, "কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডার্ন-এর সীমানা নির্ণয় করবে কে ? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা ।"[১৭] রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত এই আধুনিকতার সংজ্ঞা কেবল বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেই বক্তব্য-যুক্ত ছিল না, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বর্তমান মানসিকতা সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল, বস্তুত তাঁর এই বক্তব্যটি পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের আধুনিকতা সম্পর্কেই প্রকাশিত হয়েছিল ।

আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিতর্কিত মনে হলেও, আধুনিকের সময় নির্ণয় সম্পর্কে বোধহয় খুব বিতর্কের অবকাশ নেই । একজন পাশ্চাত্ত্য আধুনিক সমালোচকও স্বীকার করেছিলেন —

> "When we describe a work as modern, we are ascribing certain intrinsic qualities to it, though we may be vague in our minds what these qualities are ... All through the literature of the past there are certain works, which, in the attitudes they express and the problems they deal with, have a peculiar affinity with the spirit of our own time. Thus the question of date need not arise at all."[১৮]

অবশ্য প্রশ্ন যে একেবারেই থাকে না, তা নয় । এই 'মর্জি' ; 'সামনের দিকে চল্‌তে চল্‌তে'

কেন ও কিভাবে 'যোগ' নেয়, নির্দিষ্ট কালপর্বের বিশিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে তার কৈফিয়ৎ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিশেষ করে, যুগ-প্রভাব ও ঐতিহ্যের বিবর্তনকে উপেক্ষা করে হঠাৎ কোন সৃষ্টি সম্ভব হয় না, বাঁকও দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত হাডসন্ সঠিক ভাবেই বলেছিলেন —

> "A great writer is not an isolated fact. He has his affiliations with the present and the past, and through these affiliations he leads us inevitably to his contemporaries and the predecessors, and thus at length to a sense of a national literature ; as a developing organism having a continuous life of its own, yet passing in a course of its evolution through many varying phases." [১১]

আর সেই কারণেই "রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুরটিকে ধরতে গিয়ে, আধুনিক বাংলা কাব্যের "বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের" স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে আধুনিক কবি-সমালোচক শ্রী বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ থেকেই' যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন — "কোন একটা যুগ বা আন্দোলনের চরিত্র-লক্ষণ এক কথায় বলে দেওয়া অসম্ভব। ... অনেক বিরোধ, ব্যতিক্রম, অসংগতির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশের পথ এঁকে বেঁকে চলতে থাকে।"[১০] প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে গেলে 'আধুনিক' শব্দটির সংকীর্ণ ও ব্যাপক — উভয় অর্থই বিচার করা প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের উষালগ্ন থেকেই, মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক সাহিত্যের তিনটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে বা বর্তমান কালের বিচার-দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের 'সত্যকার আধুনিকতাকে' চিহ্নিত করতে গেলে রবীন্দ্রোত্তর যুগের, বিশেষ করে — 'কল্লোল' কাল-পর্বের কালকেই আধুনিক সাহিত্য বলে নির্দেশ করতে হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'শনিবারের চিঠির' ভূমিকাটিকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার এই দুটি অর্থকেই গ্রহণ করতে চেয়েছি, অন্ততঃ 'শনিবারের চিঠি'র দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার এই লক্ষণ ও কালসীমাই গ্রাহ্য ও বিবেচ্য হয়েছিল। অবশ্য 'শনিবারের চিঠি' যে আধুনিক

সাহিত্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করেছিল, তা বাংলা সাহিত্যের সেই বিশিষ্ট যুগের ফসল — 'কল্লোল' ও 'কল্লোলোত্তর সাধনা। আধুনিকতার ব্যাপক সংজ্ঞাটি তাঁদের পটভূমিকা ও সত্য পথের নির্দেশস্বরূপ মনে হয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের বিরুদ্ধতা করে পত্রিকাটি উনিশ শতকীয় সাহিত্যাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যায়ে পত্রিকাটি আবার বিশ শতকীয় যুগসাধনাকেই স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই আমরা আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে প্রাধান্য দিলেও তার সাধারণ অর্থটিকেও স্মরণ করতে চেয়েছি।

আসল কথা 'পাঁজি মিলিয়ে' সময় ধরে নয়, 'মর্জি'-গত যে বিশিষ্টতা আধুনিক কালের সাহিত্যকে উনিশ শতকীয়, এমন কি বিশ শতকের রবীন্দ্র-যুগ থেকেও পৃথক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল, আধুনিক সাহিত্যের পরিচয়ের পক্ষে সেই লক্ষণগুলিই বড় কথা। এবং এই বিশিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতটি ধরেই 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা অনুসৃত হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্টতা নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিষয়ের আত্যন্তার প্রশ্ন তুলেছিলেন; আধুনিক লেখক ও সমালোচকদের কেউ কেউ আবার স্রষ্টার 'অভিমানী অহং', 'জিজ্ঞাসা'-সংকুল সংশয়িত দৃষ্টি, 'প্রতিবাদ,' 'বিদ্রোহ' এবং প্রাচীন ও স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে 'দ্রোহবাদ' প্রভৃতি লক্ষণের উল্লেখ করেছিলেন। এবং যেহেতু এই সব লক্ষণ ইতিপূর্বেই প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে দেখা দিয়েছিল, সেই কারণে তাঁরা একটু পিছন থেকেই 'আধুনিকতার' অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন।[২১] অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, সেই সূত্র ধরেও আধুনিক সাহিত্যের যুগ-ধর্ম-সূচক কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। সেই লক্ষণসমূহ উল্লিখিত হয়েছিল ভাবদৃষ্টিগত ও প্রকাশরূপ-গত উভয় ক্ষেত্রেই। 'শনিবারের চিঠি'র দৃষ্টিকোণ থেকে পরোক্ষে পাওয়া সূত্রগুলির মধ্যে সমরোত্তীর্ণ পৃথিবী-ব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে শিক্ষিত যুবকদের নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবন ও বেকারিত্ব-ক্লিষ্ট হতাশা, আত্মবিরোধ, মূল্যবোধে ও নৈতিক আদর্শে অবিশ্বাস, অসুস্থা, স্পর্ধিত উপেক্ষা ও ভাঙনের নেশা, পলায়নী মনোভাব, বিদেশী সাহিত্যের ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদের সূত্রে পাওয়া অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, সম্পর্কবিগর্হিত যৌনাচার ও ব্যভিচার এবং স্থূল বাস্তব-প্রীতি ও শৌখিন সাম্যবাদী অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ও আদর্শের অন্ধ আনুগত্য, ঐতিহ্য বিরোধিতা, দলবদ্ধভাবে নতুন যুগসৃষ্টির অক্ষম দম্ভ প্রভৃতি লক্ষণ ইঙ্গিত-প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে ইংরেজী ভাষা ও রীতির নির্বিকার প্রয়োগ, গ্রাম্য, আঞ্চলিক, বিশেষ করে

পূর্ববঙ্গীয় ভাষা-রীতির আমদানী, বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, দুর্বোধ্যতা, ছন্দ-অলঙ্কার ও উপমার ব্যবহারে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গদ্য কবিতার প্রচলন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ অস্বীকৃতির ভঙ্গিতে নির্দেশিত হয়েছে। এই সকল প্রবণতাকে তাঁরা বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যধারার বিবর্তন-বিরোধী, জাতীয় ঐতিহ্যের ও কল্যানাদর্শের পরিপন্থী, অর্থাৎ প্রগতির অপমৃত্যু বলে বিবেচনা করেছিলেন। এবং সেই অরাজকতার প্রতিষেধক ও বিকল্প আদর্শের সন্ধানে তাঁরা ঊনিশ শতকের জনকল্যাণমুখী 'সত্যকার আধুনিকতার' রাজ্যে আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার অগ্রগতি বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে সত্যই 'ঘরে' গিয়েছিল কিনা, তার বিচার করার জন্য ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ধারাকে স্মরণ করা দরকার। বিশেষ করে কী 'শনিবারের চিঠি'র লেখকগোষ্ঠী, কী আধুনিক লেখক-সমাজ — কেউ-ই স্বীকার করেন না যে, কোন দেশের, কোন যুগের সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা ও ধারা থেকে বিচ্যুত থাকা সম্ভব।[২২] ঊনিশ শতক থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক মনন, সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকাদির ধারা পর্যালোচনা করলে আধুনিক সাহিত্যের যুগধর্ম প্রকাশের দাবি এবং 'শনিবারের চিঠি'র সেই সেই ক্ষেত্রে অস্বীকৃতির তাৎপর্য ও সার্থকতা বিচার করা সম্ভব। বর্তমান আলোচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকার মূল্যায়ণ মুহূর্তে আমরা তাই খুব সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারটিকে চিনে নিতে চেয়েছি।

খ. ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য শুরু হয়েছিল ঊনিশ শতকের উত্তরাধিকারকে বহন করে। ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন — "ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে আমরা বাঙালীর নবজাগরণের সাহিত্য আখ্যা দিয়া থাকি। ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর এই নব জাগরণ শুধুমাত্র একটা নবসাহিত্য রচনার উদ্যম লইয়া নহে, এই নবজাগরণের একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ আছে। সেই গভীরতা এবং ব্যাপকতার উৎস হইতেই এই যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টা উৎসারিত। রাষ্ট্রজীবন, সমাজজীবন, ধর্মসংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা সর্বক্ষেত্রে আসিয়াছিল প্রবল আঘাত। এই আঘাত

জাতিকে বিপর্যস্ত বা বিমূঢ় করিতে পারে নাই, আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তিতে জাতিকে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল । ... ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর সমাজ জীবনে কতকগুলি অনুকূল-প্রতিকূল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে একটি প্রবল শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল । সেই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ সমাজের মধ্যে কতকগুলি পর্বততুল্য সুদৃঢ় এবং সমুন্নত চরিত্রের আবির্ভাবে । ইঁহারা ইঁহাদের ব্যাপক কর্মচেষ্টার দ্বারা জাতিকে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন, সমুন্নতি দান করিয়াছেন,— মর্যাদা দান করিয়াছেন । ইহাই আমাদের ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । এই নবজাগরণের সহিতই যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের এই যুগের সকল সাহিত্য-সাধনাকে ।"[২৩]

রেনেসাঁস-জাত ঊনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে স্বভাবতঃই দেখা গিয়েছিল সংস্কারধর্মী ও গঠনশীল কার্যক্রম, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ প্রমুখের সাধনায় আধুনিকতার প্রয়োগমুখী লক্ষণসমূহ ধরা পড়েছিল । দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই আধুনিকতার ভাবজাত ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল, মধুসূদনের সাহিত্যে অহং-চেতনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, পুরুষকার, বিদ্রোহ-মনস্কতা ও ঐতিহ্যপ্রীতি আধুনিকতার নতুন সুরকে ধ্বনিত করেছিল, প্রকাশভঙ্গিতেও দেখা গিয়েছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাজাত নতুন ও যোগ্য আঙ্গিক কৌশল । প্রকৃতপক্ষে "মধুসূদন সেই যুগের যুগন্ধর কবিরূপে তাঁহার দিব্য প্রতিভায় এই বাণীমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে তিনি বাংলা কাব্যে নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিলেন"[২৪] বলে বিবাদী পক্ষের সমালোচক যেমন স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তেমনি প্রায় একই সুরে অতি আধুনিক কবি সমালোচকও বিশ্বাস করেছিলেন — "শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ কোরতে পারিনি । অথচ তা যদি কোরতে পারি, তবেই ফিরবে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, রচনা কোরতে পারবো ভবিতব্যতায় নিশ্চিত ইতিহাস, — আমাদের প্রকৃত রেনেসাঁস ।"[২৫] মধুসূদনের উত্তরাধিকার আমরা যে সহজে বহন করে নিতে পারিনি, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছিলেন — "মধুসূদন বাঙ্গালায় নূতন কবিতার স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার রচনার সহিত বাঙ্গালা কবিতার পূর্বাপর ধারাবাহিকতা নাই । ... মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় যতটুকু সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনায় সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশী । যে মহাকাব্য রচনার জন্য 'পাক্কা ফিট্'-এর অপেক্ষায় ছিলেন, সে মহাকাব্য তিনি কখনই লিখিতে পারিতেন না, যেহেতু মহাকাব্যের দিন কবে চলিয়া গিয়াছে । ... দৃষ্টি যদি প্রথম হইতেই অন্তরের দিকে

পড়িত, তাহা হইলে বোধকরি কাব্যকলায় তাঁহার সৃষ্টি সার্থকতর হইত ।"[২৬] বাংলা কাব্যের অন্তর সত্য ও প্রেরণাকে তিনি 'লিরিক' প্রবণতা বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন, যার সার্থক প্রস্তাবনা হয়েছিল বিহারীলালের কাব্যে ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল কথাসাহিত্যের ধারায়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই ধারার প্রবর্তক ও সার্থক সাধক । রেনেসাঁসের স্থায়ী সম্পদ — সমন্বয়বাদ, কল্যাণী ইচ্ছা, জীবনের বিস্তার ও বৈচিত্র্য এবং সুদৃঢ় ও সুগভীর আদর্শবাদ, জাতীয়চেতনা প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস ও রোমান্সে অজস্র ফসল ফলিয়েছিল । বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই ছিলেন নবজীবনের রূপকার । সমাজ-কল্যাণমুখী আদর্শের যূপকাষ্ঠে তাঁর শিল্প খণ্ডিত হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মানব-দরদী শরৎচন্দ্র । কিন্তু সেটি যে সেই যুগেরই ভবিতব্যতা ছিল, এ সত্যকেও উপেক্ষা করা চলে না । নইলে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, আধুনিক জীবনের সমস্যা তিনিও তুলতে পারেন নি । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন — "বঙ্কিমের আদর্শবাদ, জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপর কোথাও বা মহাকাব্যের বিশালতা, কোথাও বা গীতিকাব্যের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে । ... অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে । উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবি করি, রোমান্সের আকাশ-বাতাসে পরিবর্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবি পূরণ করেন না । কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয় এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্য লাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে বাস্তবাতিশয্যের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না ; কেননা তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরেই একটি বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । .... জীবনের সত্য চিত্র দিতে গিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন নাই । পরন্তু বিচিত্র রসের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ইন্দ্রধনু বর্ণ-রঞ্জিত সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন ।"[২৭] কেবল একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হিসাবেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যথার্থই যুগস্রষ্টা । তাঁর সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ, পারিবারিক ও সমাজ শৃঙ্খলার আদর্শ, উন্নততর চরিত্র-গৌরব ও নীতিবোধ প্রভৃতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যুক্তিবাদী চিন্তা, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসাবেদন, জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা, সূক্ষ্ম ও সরস বিশ্লেষণ-ক্ষমতা-সম্পন্ন সমালোচনা সাহিত্যের আদর্শ

সুস্তোজ্জ্বল হাস্যরস এবং প্রকাশভঙ্গির চরম উৎকর্ষ উপেক্ষা করার মত নয়। বরং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন —"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।"[২৮] "কর্মে, জ্ঞানে, চিন্তায় শিক্ষিত বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনার দ্বারা শিক্ষিত বাঙালীর মনে যাহাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয়, সেইজন্য এই অধ্যবসায়। সেই সঙ্গে সমাজবোধ জাগাইবার চেষ্টাও রহিল।"[২৯] এসব সত্ত্বেও আধুনিক লেখক-সমাজে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র ও উজ্জ্বল মূল্যবান 'কিউরিও' সামগ্রী হয়েই রইলেন, তাঁর উত্তরাধিকারত্ব আধুনিকেরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন। কারণ —"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তাঁর হিতবাদী লোকায়তিকতা, তাঁর এক জীবনের শিল্প-সাধনার মধ্যেই প্রাগিতিহাসের বীরগাথা নবযুগ-প্রভাতের রোমাঞ্চকর রচনাকে অতিক্রম করে শাশ্বত জগতের আশা-নিরাশাময় মনস্তাত্ত্বিক আধুনিকতায় এসে উপনীত হয়েছিল। তাঁর তত্ত্বাভিনিবেশের গাঢ়তায় সেই লেখা-মনস্তাত্ত্বিক স্বভাব-বাদের বদলে হয়ে উঠেছিল সনাতন হরানিষ্টদের অনুগামী।"[৩০] এতৎসত্ত্বেও বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আবির্ভূত ও প্রসারিত হয়েছিল, একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয় + আধুনিকতার গঠনে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

উনিশ শতকের সম্পদ নিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভা কেবল উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের অর্ধাংশ বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনকে বিভাবিত রেখেছিলেন, তাই নয়, তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালীর নিত্যকালের পাথেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য নির্দেশ করতে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছিলেন — "বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সমাজ শাসনের ও নীতিশিক্ষার অন্যতম উপায় রূপে, তাই তাঁহার রচনা উপদেশ-পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সেভাবে দেখেন নাই। তাঁহার কাছে সাহিত্য বাহির হইতে সংগৃহীত আদর্শের ব্যাখ্যা নয়, জ্ঞানের পসারও নয়, সাহিত্যের কাজ জীবন-মননের ফসল ফলানো। .... বঙ্কিমোত্তর বাংলা সাহিত্যধারার পরাবর্তন রবীন্দ্রনাথের 'সাধনায়। ...'সাধনার সাধনা রবীন্দ্রনাথের ঘরের সাধনা, বাহিরের সঙ্গে ঘরের সুগভীর যোগের সাধনা।"[৩১] ঐতিহাসিক একথাও বলতে দ্বিধা করেন নি যে,—"বাংলায় আধুনিক সাহিত্যের বীজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল। এ ঘটনা বিংশ শতাব্দ আরম্ভ হইবার দশ পনের বছর আগেকার। যেখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনায় নিজের পথটি চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, সেইখানেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার

সূত্রপাত ।[৩২] বাস্তবিক কেবল সাহিত্য-রাজ্যের বিচিত্র পথেই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আধুনিক মনের সকল চিন্তা, সকল সংশয়, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তারে ও গভীরতায় তিনি বিস্ময়কর স্বাক্ষর রেখে গেছেন । সেদিক থেকে তিনি সত্যই আধুনিকতা তথা রবীন্দ্র-উত্তরণের সোপান স্বরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন — "বাংলা দেশের পক্ষে বড্ড বেশী বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপ-জোখের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান।"[৩৩] — এটি আক্ষরিক ও ব্যঞ্জিত অর্থে সবটুকুই সত্য । ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন — "ঊনবিংশ শতকের শেষে বঙ্কিম-যুগের অবসান ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-যুগের অভ্যুদয় । ....নূতন শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের মনোভাবকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিল । এই আদর্শ নিজ অলক্ষিত স্বরূপেই আমাদের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া উঠিল । বাঙালী জীবনে এত নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইল এত নূতন রসধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে আমাদিগকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি আর বাঙালী জীবনের ঐতিহ্যানুসারী না হইয়া উহাকেই গভীর ভাবে রূপান্তরিত করিতে লাগিল ।"[৩৪] সমগ্র রবীন্দ্র-সাধনাকে দুটি পর্বে ভাগ করে নিলে দেখা যাবে প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রবর্তিত সাহিত্যাদর্শকে আরও বিস্তারিত ও উদারতর পরিমণ্ডলে গ্রহণ করলেও মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানলব্ধ জাতীয়তাবোধ, ঐতিহ্যানুসরণ ও সাহিত্যক্ষেত্রে রোমান্টিক স্বপ্নেই কিছুটা বিভোর ছিলেন, তাঁর প্রকাশরীতিতেও একটা সাধারণ স্থিতাবস্থা বজায় ছিল । 'সাধনা', 'ভারতী' এবং 'বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়'— পর্বে রবীন্দ্রনাথের এই সাধনপন্থা কিন্তু 'সবুজপত্রের' যুগ থেকে আরও অগ্রসর হয়েছিল । বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও বক্রোক্তিমূলক প্রকাশভঙ্গিতে তিনি বিশ শতকের মানসিকতা ও জটিল জীবন-সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন । কথাসাহিত্যে ও কাব্যে সর্বত্রই পূর্বের সেই রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে আধুনিক সাহিত্যের মূল দর্শন-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল । সেই সঙ্গেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের একান্ত ধর্ম হিসাবে ঔপনিষদিক গূঢ়তা, আত্মলীন ধ্যানতন্ময়তা ও অননুকরণীয় ভাষা-ভঙ্গি প্রকাশ পেল । তিনি তখন জাতীয় কবি তো দূরের কথা, বাস্তব জগতেরও যেন কেউ নন । তাঁর এই ঋষি সত্তাই আধুনিক কমলের পুরো সম্ভার সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর নিজস্ব দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল ।

এ সব সত্ত্বেও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব এমনই দুরতিক্রম্য ও অনিবার্য ছিল যে, রবীন্দ্র-বৃত্ত থেকে এই সময়ের লেখকদের, বিশেষ করে কবিদের, মুক্তির

উপায় ও পথ ছিল না । ফলতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য স্পষ্টতঃই রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগ হিসাবে চিহ্নিত ছিল । এই পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস রায় প্রভৃতি রবীন্দ্র-ভক্ত কবিরা ভাববস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, ছন্দ-নির্মাণ কৌশলে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হলেও, এবং পরবর্তী যুগের ওপর কোন-না-কোন ভাবে কিছু প্রভাব বিস্তার করলেও সুরধর্ম ও মানসিকতার দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন মুখ্যত রবীন্দ্রানুসারী । সেই কারণেই হয়ত সুধীন্দ্রনাথ এঁদের বলেছিলেন — 'রবি-মুখ বিবিধ চিত্রল পতঙ্গ' ।[৩৫] এঁদের তুলনায় বরং মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি কবিগণ রবীন্দ্রোত্তর যুগান্তরের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ভাব-রূপ ও প্রকাশ-রূপ উভয় ক্ষেত্রেই এই সকল কবিরা 'রবীন্দ্রনাথের পর নতুন সুর' ফুটিয়ে তুলেছিলেন কিছুটা। মোহিতলালের 'বলিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা বা সংস্কার-রাহিত্য'[৩৬] প্রভৃতি 'কালাপাহাড়ী' লক্ষণ তাঁকে 'আধুনিকোত্তম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল । "সত্যেন্দ্রনাথ — নজরুলের মত তিনি আরবি-ফারসী শব্দের ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখালেনই, তদুপরি সংস্কৃত শব্দের গম্ভীর মন্দ্র, দীর্ঘ তান-প্রধান ছন্দের বিলম্বিত গতি সৃষ্টি করে সেই যুগের এলিয়ে পড়া কাব্যে একটা স্বকীয় বলিষ্ঠতা সঞ্চার করলেন ।"[৩৭] যতীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন নাস্তিকের অবিশ্বাসী দৃষ্টি ও দুঃখবাদ।" "যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিটিই প্রকৃতপক্ষে পাঠককে মুগ্ধ করে ।"[৩৮] "আমরা কল্লোলের অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি 'বিশ্বরণী'র বড়ো বড়ো তাল, ঢেউয়ের মত গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে — সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মত সুর ।"[৩৯] আর নজরুল, — "মনে হল এমন কখনো পড়িনি । অসহযোগের অগ্নি-দীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই-যেন বাণী ।"[৪০] অর্থাৎ এই কবি-গোষ্ঠীর প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কাব্য-সংস্কার পুরোপুরি না হলেও বেশ একটু হোঁচট খায়, বাংলা কাব্যে একটা পালাবদলের পূর্বাভাস বা প্রস্তাবনা যেন গড়ে উঠতে থাকে । কিন্তু অতঃপর মোহিতলাল তাঁর কবি-সত্তার চেয়ে সমালোচক-সত্তার ওপরই ঝুঁকে পড়লেন । তাঁর দৃষ্টিতে উনিশ শতকীয় সত্যসুন্দরের আদর্শ ধরা পড়ে নিজেরই আরব্ধ কাব্য-সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিতে চাইল । যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং নজরুলের বিদ্রোহী -বাণীতেও কিছুটা ক্লান্তিবোধ করেছিলেন যুগের কবি ও পাঠক সম্প্রদায়; তাঁরা নিছক দুঃখের ভারে যেমন ভেঙে পড়তে চান নি, তেমনি হয়ত বিদ্রোহীর ঝঞ্ঝা-নিনাদে ভাবাবেগ ছাড়াও নতুন কিছু আশা করেছিলেন । পরবর্তী সময়েও

78291
JUN 1982
NORTH BENGAL ★ UNIVERSITY LIBRARY

এঁদের অনুগমন অব্যাহত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে 'কল্লোল'-পর্বের আগে বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগলক্ষণ ও মানসিকতা ঠিকমত সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি । তবু এই সকল কবিদের চেষ্টায় সেই সময়ে যে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি, তথা আধুনিকতার ভিত্তিটি সম্ভাবনা-যুক্ত হয়েছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না । বরং এখানেই তাঁদের কৃতিত্ব ।

এই পর্বের কথাসাহিত্যের চর্চাতেও একই অভিজ্ঞতা হয় । এখানেও লক্ষ্য করা যায় যে, রবীন্দ্র-যুগে বাস করেও এই সময়ের কথাশিল্পীরা রবীন্দ্র-মানস-পুষ্ট হয়েও যেভাবে বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-রীতিতে অভিনবত্ব সম্পাদন করেছিলেন, তা তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর হয়ে উঠেছিল । এঁদের গল্প-উপন্যাসগুলিতে সহজ সরল জীবনচিত্র সরস ভঙ্গিতে এবং বাস্তব ভিত্তির ওপরে যেভাবে ফুটে উঠেছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা ও গভীর জীবন-দর্শনকে এঁরা সঠিকভাবেই পাশ কাটিয়ে কথাসাহিত্যের নিজস্ব ক্ষেত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সহজ সরল ও কৌতুকের দৃষ্টিতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনালেখ্যটিকে আমাদের যথাযথ পারিপার্শ্বিকতা সহ ফুটিয়ে তুলেছিলেন । সুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করে এবং বর্ণনার প্রাধান্য না দিয়ে চরিত্রের সংলাপ-সূত্র ধরেই তিনি যেভাবে তাঁর গল্পকে ঘটনাস্রোতে বহমান করে দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালের শরৎচন্দ্রকেই মনে পড়িয়ে দেয়।[৪১] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্পে দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পীর তুলির টান-জাত রেখা ও রঙের মাদকতা । রূপকথার স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে কথকতার মনোহারিতা জড়িত করে তিনি অবিশ্বাস্য এক ঘরোয়া অথচ স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন । এ সাধনায় তিনি অনন্য ।[৪২] অপর দিকে প্রমথ চৌধুরী মনন-দীপ্ত হাস্যরসোজ্জ্বল ভঙ্গিতে যেভাবে গল্প রচনা করে গেছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা ধরা পড়েছিল । এগুলি যেন 'ইস্পাতে গড়া মূর্তি, পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ'।[৪৩] বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিক-গত ধারায় তিনি পূর্বসূরীর ভূমিকা পালন করেছিলেন খুবই সার্থকতার সঙ্গে । বক্তব্য-গত ও ভাবগত দিক দিয়ে আধুনিক কথাসাহিত্যের সূচনা করে দিয়েছিলেন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর শেষ পর্যায়ের লেখকেরাও । জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা কিছুটা ভাবালুতা ও চটক সৃষ্টির দিকে প্রাধান্য দিলেও বাস্তবতার অনুসরণে, অসামাজিক প্রণয় ও সমাজ-চ্যুত পতিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুসরণে আধুনিক লেখকদের পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন । এঁদের মধ্যে বিশেষ করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কন্টিনেন্টাল্ সাহিত্যের অনুসরণে সমাজ ও পরিবারের নীতি-নিয়ম সমূহকে ধূলিসাৎ করে, বাস্তবতার

নামে যৌনতা, বস্তি-বিলাস ও ব্যভিচারের চিত্র অঙ্কনে যেভাবে মত্ততা সৃষ্টি করছিলেন, এবং নতুন আদর্শ রূপে তাকে উপস্থাপিত করছিলেন, তাতে এতাবৎ-কাল প্রবাহিত কথা-সাহিত্যের ধারায় হঠাৎই যেন এক নতুন সুর জেগে উঠেছিল। অথচ এই সকল লেখকেরা কেউই প্রগতিপন্থী ছিলেন না, তাঁদের অবলম্বিত 'ভারতী' 'মানসী', 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকা-গুলিও মোটামুটি রক্ষণশীল পত্রিকা বলেই পরিচিত ছিল।" জীবন-সৃষ্টিতে এবং শিল্প সৃষ্টিতে এঁরা বিদ্রোহী নন, এঁদের সৃষ্ট কোন কোন চরিত্রে দুঃসাহসের পরিচয় থাকলেও সামগ্রিকভাবে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বেপরোয়া দুঃসাহসী নয়। ... তবু এই 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই আগামী দিনের বিদ্রোহী উত্তর-সূরীদের বীজ নিহিত ছিল। ... তা 'কল্লোল'-পন্থী তরুণ লেখকদের আবির্ভাবে যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।"[88] ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেনও মন্তব্য করেছিলেন —"ভারতীর দলের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া নবীন সাহিত্যিকেরা 'বাস্তব' প্রবণ হইলেন। ...কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমান্টিক কল্পনা-বিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বস্তিবিলাস হইয়া দাঁড়াইল। ... এই 'বাস্তব' বিলাসিতার বা 'বাস্তব' দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন 'ভারতীর' আসরে। লালন খানিকটা 'নারায়ণের' পৃষ্ঠায়। স্পষ্ট যৌন আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।"[8৫]

এই সময়ের আরও একজন কথাসাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য এই সূত্রে স্মরণ করতে হয়, যিনি রবীন্দ্রনাথের মত দুটি যুগেই সমান জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ভারতী' পর্বেই। তাঁর সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রভাত কুমারের প্রভাব গোড়ার দিকে বেশ ভালভাবেই পড়েছিল, কিন্তু উত্তর-পর্বে তিনি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় বৃত্তে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন —"বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিকই বলিতে হইবে।"[8৬] ঘটনা ও সাহিত্যের প্রভাবদৃষ্টে ঐতিহাসিকের এই মতামত যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠ ও নীতি-প্রাধান্যযুক্ত গল্প-রস যেমন বাঙালীর রস-সুধাকে পুরোপুরি মেটাতে পারে নি বলেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি-প্রদর্শন অনিবার্য ছিল, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনার মহত্ত্বও সাধারণ পাঠককে অভিভূত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাঁরা শরৎ-সাহিত্যে নিজেদের অবিকল প্রতিবিম্ব দেখেই তৃপ্ত

হয়েছিলেন । শরৎ-চেতনার বিবর্তনে পূর্বসূরীদের প্রযত্নও গভীরভাবে কাজ করেছিল । ডঃ সুকুমার সেন বলেছিলেন —"সমাজ-সংস্কারের দিকে শরৎচন্দ্রের কোন ঝোঁক তো ছিলই না, অধিকন্তু বিমুখতাই ছিল বলা যায় । ....শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র তাঁহার সমাজ-বোধের মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য-শিল্পেও ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তখন আর সময় ছিল না । তাহার সৃষ্টিশক্তি তখন নির্বাণোন্মুখ ।"[৪৭] শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারের সচেতন ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের মূঢ় হৃদয়হীন সমাজের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে, সমাজের নিপীড়িত পতিত নারী-সমাজের মধ্যে সত্য-নিষ্ঠা, মানবতা ও সতীত্বের আবিষ্কারে, সীমাহীন দরদী ও আন্তরিক সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র যে বাংলার একটি উপেক্ষিত দিককে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না । অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথের পথে না হোক, বাঙালীর সংস্কারকে পুরোপুরি অস্বীকারও করতে পারেন নি, তাও সত্য । এখানেই আধুনিক লেখকদের মানসিকতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য । শেষ জীবনে একমাত্র 'শেষপ্রশ্ন' হয়ত এক পরীক্ষামূলক ব্যতিক্রম— যেখানে তিনি আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতাগুলিকে যেন বুঝতে চেয়েছিলেন । ঠিক তুলনা করা না গেলেও, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'ও প্রায় একই ধরনের মানসিকতা অনুভব করা যায় । এমন কি, ঐতিহাসিকের এই বিচারও প্রণিধানযোগ্য —"সমাজ-সমস্যায় বাস্তবদৃষ্টি-সম্পন্ন হইলেও শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিস্ট্, অর্থাৎ যথাযথপন্থী লেখক বলা চলে না ।"[৪৮] শরৎ-দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রভাব ও তাঁর বন্ধাহীন হৃদয়োচ্ছ্বাস সত্ত্বেও কিন্তু তিনি চরিত্র ও প্লটের জটিল বিন্যাসে, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তির প্রয়াসে, বাস্তব সমস্যার গূঢ়তার প্রতি সযত্নময় ইঙ্গিত প্রকাশ করে কেবল জনগণ-চিত্ত অধিকারই করেন নি, যুগধর্মকেও অনেকটা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছিলেন । এক সময়ে শরৎচন্দ্রের কটু সমালোচক 'শনিবারের চিঠি'র তাত্ত্বিক নেতা ও পরিচালক মোহিতলালও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন —"আধুনিক যুগ-সঙ্কটের অভ্যুদয় গত যুগের বাঙালী সমাজের একটি প্রাণগত পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে । শরৎচন্দ্র প্রাণে মনে সেই গত যুগেরই বংশধর । তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিলীয়মান যুগের বাঙালী-সভ্যতা, বাঙালী-সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি তাহাই বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে ।"[৪৯] এই যুগে লেখা রবীন্দ্রনাথের —'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র', 'তিনসঙ্গী', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসের মানসিকতার সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যকে মিলিয়ে নিয়ে পড়লে এ যুগের শরৎ-চেতনার বৈশিষ্ট্য ও অনিবার্যতা, এবং রবীন্দ্রনাথের পরেও তার বিস্তারের পরিমাপ করা অসম্ভব হয় না । এই পর্বে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্টতা এইখানে যে, " সমকালীন বাংলার

সমাজে ও সাহিত্যে যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা মাথা তুলছিল, — একটি 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথ-সমর্থিত ক্রমবিকশিত ব্যক্তি-চেতনার ধারা, আর একটি, প্রাচীন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাবান রক্ষণশীল ধারা, — এ দুটি ধারাই যেন শরৎচন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়।"[৫০] ডঃ শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আরও স্পষ্ট করে মন্তব্য করেছিলেন —"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাভঙ্গির অননুকরণীয়তা ও কাব্যগুণ-সমৃদ্ধির জন্য উপন্যাসের সাধারণ বিবর্তন-ধারার বহির্ভূত। সেই বিবর্তন-ধারা শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ও তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নূতন বাঁক লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমন, তেমনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এক অভিনব দৃষ্টির প্রবর্তক, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কবি ও ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইহাঁদের প্রভাব দুরতিক্রম্য। ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতি ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশের অনুসরণ করিবে।"[৫১]

বাংলা সাহিত্যের এই পালাবদলের এবং বিবর্তন-ধারার ইতিহাসটিকে বুঝতে গেলে কেবল এই সকল ব্যক্তি-প্রধান সাহিত্যিকের পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়, এই সময়কালের বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকাগুলিও যথেষ্ট মূল্যবান সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের সাহিত্য পত্রিকা-নির্ভর, সাময়িক পত্রিকা-সমূহের মধ্য দিয়েই সমকালীন যুগ-রুচি ও যুগ-সাধনার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। শ্রী সজনী কান্ত দাস খুব সংক্ষেপে আধুনিক কালের যুগ-মানসটিকে বোঝাতে গিয়ে সাময়িক পত্রিকাদির ভূমিকার পর্যালোচনা করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য —"বঙ্গদর্শনের' দর্পণে বাঙালী নিজের মুখ দেখিয়া পুলকিত হইল। বঙ্কিম বিদেশের সোনাকে ভস্ম করিয়া স্বদেশের শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইলেন। আসিল ইওরোপীয় মনীষিদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন দর্শন, সায় মার্কসবাদ পর্যন্ত, কিন্তু ভারতীয় মূর্তি লইয়া। তাহার পর 'ভারতীতে' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'সাধনা' সমগ্র বঙ্গদেশের 'সাধনায়' রূপান্তরিত হইল পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যভারে। রবির কিরণ-দীপ্ত সেই আমাদের তরুণ মধ্য দিন।"[৫২] এ সবেরও আগে 'সংবাদ প্রভাকরে' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) "নবযুগের বাংলা সাহিত্যের পত্তনে'র, বিশেষ করে —"বাংলা কবিতার পুনর্জন্মের" প্রয়াসকেও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী' (অক্ষয়কুমার দত্ত), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র), 'মাসিক পত্রিকা' (প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার), 'সমাচার দর্পণ' (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি তৎকালীন পত্রিকাগুলি যেভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গল্প-রসের জোগান দিয়ে জাতীয় সংস্কারবুতে প্রয়াস করেছিলেন, সজনীকান্ত সেই ইতিহাসকেও বিস্মৃত হতে চান নি। — — — — — — — — — — — — —

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। "বিশ্বমহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইওরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্র মূর্তি লইয়াই বাংলার আঙিনে প্রবেশ করিতেছে। ... সে কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা।"[৫৩] বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানসিকতাটি কিন্তু ইতিপূর্বেই সাময়িকপত্রের ধারাতেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল।" ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না।"[৫৪] কাজেই দেখা দিয়েছিল 'সবুজপত্র'। প্রাক্‌যুদ্ধপর্বে পত্রিকাটি জন্মলাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে কালান্তরের বাহক হিসাবে পত্রিকাটির ভূমিকা দেখা দিয়েছিল যুদ্ধোত্তর মানসিকতার বিচিত্র স্খলনকে স্বীকার করে। শ্রী ধূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই মানসিকতা বা বিশিষ্টতাকে উল্লেখ করেছিলেন —"বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য"[৫৫] বলে। শ্রী প্রমথ বিশীর মূল্যায়নও ছিল —"সবুজপত্র সম্পাদনা...নূতন সম্ভাবনায় ও নূতন সংকেতে পূর্ণ সুফলকণ্টাক্রান্ত ব্যাপার। এটি একটি মহৎ ঘটনা।"[৫৬] শ্রী বুদ্ধদেব বসুও মন্তব্য করেছিলেন —"বাংলা পত্রিকার সেই আদি যুগে — যখন পাঠক ছিলো স্বল্প এবং আজকের তুলনায় অনেক বেশি সমভাবাপন্ন, তখন বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকা দুটিকে ('বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনা') তাঁদের একান্ত সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই নিবিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন, প্রতিবাদের প্রয়োজন তখনো প্রবল হয়ে ওঠে নি। ...'সবুজপত্রে' এই লক্ষণ পুরোমাত্রায় বর্তেছিলো। তাতে বিদ্রোহ ছিলা, যুদ্ধঘোষণা ছিলো, ছিল গোষ্ঠীগত সৌষম্য। 'সবুজপত্র' বাংলার প্রথম লিট্‌ল ম্যাগাজিন।"[৫৭] একইভাবে রবীন্দ্র-প্রশ্রয়-পুষ্ট ও পুরাতন ধারার পত্রিকা 'ভারতী'ও তার শেষ পর্যায়ে (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে, ১৮৮৮-১৯২১) সমরোত্তীর্ণ মানস-বৈশিষ্ট্যের আধার হয়ে উঠতে চেয়েছিল।" এই 'ভারতী-গোষ্ঠী' 'সবুজপত্রের' মত ততখানি স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত না হলেও, এর কথা সাহিত্যিকদের রচনাতেও নূতন কালের সজীব স্পর্শ স্পষ্টই অনুভব করা যায়। প্রচলিত ধরণের একঘেয়ে বিষয়বস্তুর আশ্রয় না নিয়ে নূতন পথের সন্ধানে তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। সঙ্কীর্ণ নীতিবোধের সীমা অতিক্রম করে 'বাস্তবতা'র সন্ধানে তাঁরা সমাজ-নিষিদ্ধ বহু বিষয় ও চরিত্রকে কাহিনীর মধ্যে সাগ্রহে স্থান দিয়েছেন। ইউরোপীয় উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ ও ইউরোপীয় উপন্যাসের অনুসরণ 'ভারতী' গোষ্ঠীর কথাশিল্পীদের সাহিত্য-প্রয়াসকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। ...'সবুজপত্র' কিংবা 'ভারতীর' মত সাহিত্য-পত্র দীপ জ্বেলে রেখেছিল আগামী দিনের উত্তরসূরীদের জন্য। 'সবুজপত্র' ও 'ভারতী'কে যথার্থই নূতন দিনের সাহিত্যের অগ্রণী গোষ্ঠী বলা চলে।"[৫৮] ডঃ সুকুমার সেনও উল্লেখ করেছিলেন —"ভারতীর দলের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া নবীন সাহিত্যিকেরা বাস্তব-প্রবণ হইলেন।" এমন কি "ভারতীর আসর ভাঙিয়া আসিলে,

মনভাঙা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা-পুশের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন।"[৫৯] এই সময়-পর্বে প্রচলিত আনন্দবাজার পত্রিকা (১২৮৫), প্রবাসী (১৩০৮), যমুনা (১৩১৯), ভারতবর্ষ (১৩২০), মাসিক বসুমতী (১৩২১) প্রভৃতি 'পাঁচমিশালী' সাহিত্যের সুবৃহৎ 'অমনিবাস' গুলিও কেবলমাত্র 'কাটতির অনুপ্রেরণাতে শ্রীত হই[৬০] ছিল না, যুগ-প্রভাবজাত লক্ষণসমূহ ও প্রয়াসগুলিকেও তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এইভাবেই ধীরে ধীরে সাময়িক পত্রিকার ধারা-স্রোতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটেছিল।

অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতার সঙ্গেই বিরোধী রক্ষণশীল ধারা এই প্রবহমানতার সঙ্গেই বারবার দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই এই বিরোধ-পর্ব দেখা দিয়েছিল। "ভারতী প্রচারের বিরোধ চুকিয়া গিয়া নূতন করিয়া দেখা দিল 'সঞ্জীবনী'-বঙ্গবাসী'র দ্বন্দ্ব। ... বেলা পড়িলে রৌদ্রের তাপ ঘুচিয়া যায়, কিন্তু বালির তাত চট করিয়া মিলায় না।"[৬১] সুতরাং কিছুকাল পরে 'সাহিত্য', 'নবজীবন', 'জন্মভূমি', 'নারায়ণ' প্রভৃতি দেখা দিল। এই সকল পত্রিকায় মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ এবং পরে 'সবুজপত্র' আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং তারও পরে 'মানসী' 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি আবির্ভূত হয়ে ঘড়ির কাঁটাকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ছাড়াও এঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-স্পৃহাও এ সকল প্রয়াসের পিছনে দুর্লভ ছিল না। তবে এই সকল পত্রিকার স্বপক্ষে এইটুকুই বলা যায় যে, এই ধরণের বিরোধী মনোভাবও তো যুগেরই প্রতিফলন। "অস্তি ও নাস্তিকে একত্র করেই তো চলে জীবনের অগ্রগতি,"[৬২] — চলা ও থামার ছন্দ। সেই সঙ্গে তরুণ সাহিত্য-ধর্ম সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য ও মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, এই বিরোধ-পর্ব অন্ততঃ জিজ্ঞাসা ও বিচারশীল প্রাণধর্মকেও অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করে এই সকল পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী গল্প-রসের যোগান যেভাবে দেওয়া হয়েছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তারও মূল্য অনস্বীকার্য। এমন কি, এও দেখা গেছে যে এই সকল রক্ষণশীল পত্রিকারও অনেকগুলি পরে যুগধর্মকে স্বীকার করে নিয়েই যুগের ফসলের আধার হয়েও উঠেছিল। এটিও অস্বীকার করা চলে না যে, এই পত্রিকাগুলির ভূমিকারও প্রয়োজন ছিল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর নবযুগের বিশিষ্ট ধর্মটির পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ জীবেন্দু সিংহরায় মন্তব্য করেছিলেন — "তরুণ বাঙালীর মন ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছিলো মনুষ্যত্বে প্রত্যয়তা, বাস্তব ও জনগণ-তান্ত্রিক চেতনা, যৌন সলজ্জতাবোধ, মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচার-জাত

নতুন মূল্যবোধ এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদ-চেতনা।"[৬৩] 'ভারতীর' শেষ পর্যায় থেকেই এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি অল্প-স্বল্প প্রকাশ পাচ্ছিল, প্রত্যক্ষভাবে এই মানসিকতা ধরা পড়েছিল তৃতীয় দশক থেকে, —'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। সমালোচকেরা লক্ষ্য করেছিলেন — ''যে সমস্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ও কল্পনাকে মানুষ জীবনে স্বীকার করেছে, কিন্তু সাহিত্যে-শিল্পে অনাচরণীয় বলে মনে করে নি, তাদের ভাষা দেওয়া শুরু করেছে কবিতায়, কথা-সাহিত্যে, 'প্রবাসী'র শুচিতা ও 'সবুজপত্রে'র বৈদগ্ধ্যের বন্ধ্যা মাটিতে নবযৌবনের জোয়ার এলো একটা"।[৬৪] এই 'অনন্যতার সাধনাই 'কল্লোলের' ''কল্লোলের বিক্ষুব্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিলো না, ছিলো বর্ণনার ক্ষেত্রে, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়, রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে।"[৬৫] 'কল্লোলের' (১৩৩০) সঙ্গে এই সাধনায় ব্রতী হয়েছিল তার আরও দুটি পত্র —'কালি-কলম' (১৩৩৩) ও 'প্রগতি' (১৩৩৪)। আরও একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তরুণ লেখকদের এই যুগ-সাধনায় প্রকৃতপক্ষে বহু শাখাই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রধান ছিল— বিজলী (১৩২৭) আত্মশক্তি (১৩২৮), ধূমকেতু (১৩২৯) সংহতি (১৩৩০) নবযুগ (১৩৩১) উত্তরা (১৩৩২), ধূপছায়া (১৩৩৫), নবশক্তি (১৩৩৬) প্রভৃতি। অবশ্য গোড়া থেকেই এই বিশেষ উদ্দেশ্য ও ভূমিকা 'কল্লোলে' বিশেষ দেখা যায় নি, শ্রী সজনীকান্ত দাস এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন —" বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে, আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয়,— সেই রকমই পাঁচ মিশেলী ব্যাপার —, থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। ... যুগ পরিবর্তনের কোন সূচনাই ইহাতে ছিল না।"[৬৬] এর তুলনায় বরং যুগবাণী-পরিচয় সে সময়ে 'যমুনা,' 'ভারতবর্ষ,' 'বঙ্গবাণী,' 'মাসিক বসুমতী,' 'নারায়ণ,' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাতেই ইতস্ততঃ প্রকাশ পাচ্ছিল বলে সজনীকান্ত উল্লেখ করেছিলেন। ১৩৩৩ সাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে "ভল-কল্লোল ঘোল-কল্লোল হওয়ার সাধনায়" মেতে উঠতে সক্ষম হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।[৬৭] অর্থাৎ এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর বহু শাখা-বিশিষ্ট সমবায়ী সাধনাতেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা দিতে শুরু হয়েছিল, সমাজের সর্বনিম্ন, অস্বীকৃত, ধিক্কৃত ও নিষিদ্ধ এলাকা থেকে উপকরণ ও পরিবেশ সংগ্রহ করা চলেছিল, বিজ্ঞান, বাস্তবতা ও ইজমের নামে নানা পরীক্ষামূলক দুঃসাহসিক প্রয়াস স্পর্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, জাতীয়তা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ প্রভৃতিতে জেগেছিল অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা ও বিপর্যয়, বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের প্রতিবিম্ব পড়েছিল। প্রকাশ-রূপের ক্ষেত্রেও সনাতন পদ্ধতির বদলে ইংরাজী ভঙ্গি ও ভাষার নির্বিচার ব্যবহার, গ্রাম্য, আঞ্চলিক ও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা-ভঙ্গির আমদানী, বানান ও ব্যাকরণের

ক্ষেত্রে অনাচার, ছন্দ, উপমা ও কল্পনাভঙ্গিতে কৃত্রিমতা, যথেচ্ছাচার ও দুর্বোধ্যতা, এবং সমবেত প্রয়াসে নবযুগ-সৃষ্টির দাবি প্রভৃতি এই যুগের তরুণ-সাধনার সাধারণ লক্ষণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল ।

তরুণ লেখকদের যুগসৃষ্টির এই প্রাথমিক স্তরে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ও হাস্যকর স্পর্ধার প্রকাশ ঘটেছিল । 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রধান লেখকও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি,"—"এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে 'কল্লোলে'র স্রোতে অনেক কাদা, অনেক খড়কুটো, অনেক নোংরা, ইউরোপীয় জীবনের অনেক পচা পাতা ও ঝরা পাতা এসে ঢুকলো আমাদের মগজে, প্রকাশ পেলো আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে । ... তবু এর স্রোতটাই ছিল আসল কথা । ... এই স্রোতেই ... আমাদের সাহিত্যে প্রাচুর্যের জন্যে জমি হয়েছে উর্বর । সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতির পরিবর্তে স্বল্প শক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের যুগ হলো শুরু । ... তা সার্থক হয়েছে 'কল্লোল' ও 'কল্লোলোত্তর যুগে'[৬৬] ।" তাছাড়া —"সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজ সমান জোর দিয়া করিতে গিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইঁহাদের রচনাও প্রচারে উগ্রতা ও আতিশয্য দেখা গেল । ... নিজেদের সাহিত্য-মতের ও সাহিত্য-সৃষ্টির দালাল-গিরি রীতিমত ভাবে এই-ই প্রথম । ইহার ফলও মিলিয়াছিল । অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানতঃ প্রোপাগাণ্ডার জোরেই উঠিয়াছিলেন ।"[৬৭] স্বভাবতঃই আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলনের পরিণত পর্যায় যখন থেকে শুরু হল, সেই সময় থেকে হৈচৈ-এর বদলে দৃঢ় প্রত্যয় ও নিরলস অনুশীলন শুরু হয়েছিল । ইতিমধ্যে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক নতুন মুখ যথার্থ ক্ষমতার অধিকারী বলে রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেরই স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বভাবতঃই জোর পড়েছিল কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে । পরিচয় (১৩৩৮), শতাব্দী (১৩৪১), ভবিষ্যৎ (১৩৪১), কবিতা (১৩৪২), পূর্বাশা (১৩৪৩), চতুরঙ্গ (১৩৪৩), নিরুক্ত (১৩৪৩), প্রভৃতি পত্রিকায় কাব্য-চর্চার নিত্য-নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল মূলতঃ কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই । চতুর্থ দশক থেকে তরুণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু । শ্রী বুদ্ধদেব বসু নিজেও স্বীকার করেছিলেন —"কল্লোলের তোলপাড়ের পর ঘর গোছাবার কাজ নিয়ে সে ('পরিচয়') এসেছিলো, 'কল্লোলে' যা ছিলো না, তাই ছিলো 'পরিচয়ের সম্পদ । ...'পরিচয়' নিয়ে এলো রুচি, বিচারবুদ্ধি, চিন্তার শৃঙ্খলা । পশ্চিমী সাহিত্যের নতুন ধারাটিকে 'পরিচয়' আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল করে তুললো, সম-সাময়িক বিশ্বমনের বাণী শোনালো — বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা-

সকলক্ষেত্রে"।[৭০] বিশেষ করে কবিতার চর্চাতেই এই পর্যায়ে 'পরিচয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ডঃ সুকুমার সেন এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন —"প্রগতি-বাদীদের উগ্রতা প্রায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে । এখন নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া এক কাব্যশিল্প প্রবর্তনের দিকে ঝোঁক পড়িল কয়েকজন ইংরেজী-নবিশ লেখকের । ইঁহাদের একজন, রবীন্দ্রনাথের একদা স্নেহভাজন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'পরিচয়' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন । উদ্দেশ্য — বাঙালী পাঠকের কাছে নূতন ইংরেজী কবিতার এবং নূতন ইংরেজীর কবিদের গুরুস্থানীয় ফরাসী ও জার্মান কবিদের রচনার পরিচয় দেওয়া এবং নূতন নূতন বিদেশী গ্রন্থের সংবাদ টাটকা টাটকা যোগানো । সেই সঙ্গে নূতন ইংরেজী কবিতার অনুকরণে নূতন বাংলা কবিতার পরিচয় দেওয়াও তার এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ।"[৭১] এঁদের এই সময়ের নতুন কাব্যাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ সেন ইংরেজী 'ইমেজিস্ট' কবিতার লক্ষণগুলি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন —"সুতরাং নূতন কবিতার পাঠকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম হইতে বাধ্য ।"[৭২] বাংলা কাব্যে এই বিশিষ্ট রীতিটি আজ সর্বত্র স্বীকৃত । আধুনিক কাব্য সাহিত্য চল্লিশের দশকেই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকাটিকে সঠিকভাবে জানতে গেলে বাংলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার বিবর্তনের ইতিহাসটিকে যেমন আগে স্মরণ করে নেওয়া প্রয়োজন, তেমনি 'শনিবারের চিঠি'র আরও যে একটি পরিচয় ও বিশিষ্টতা ছিল — রঙ্গ-ব্যঙ্গ পত্রিকা হিসাবে, সেক্ষেত্রেও পত্রিকাটির স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব বুঝতে গেলে এই ধরণের 'খিড়কির দরজা'গুলির ধারা-বিবর্তনও স্মরণে রাখা ভাল । এ কথা ঠিক যে, 'শনিবারের চিঠি' জন্মলগ্নে রঙ্গ-ব্যঙ্গ পত্রিকা হিসাবে তার পরিচয়টিকে প্রকাশ করতে চাইলেও পরবর্তীকালের সচেতন উদ্দেশ্য ও ভূমিকা তার সেই বিশিষ্টতাটিকে অস্বীকার করতেই চেয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ের কার্য-প্রণালীতেও 'শনিবারের চিঠি' তার মূল চরিত্র ও ভঙ্গীটিকে একেবারে বিসর্জন দেয় নি, বরং পত্রিকাটির বিশিষ্টতাটি আজ পর্যন্ত ব্যঙ্গধারাতেই উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে কোন অগৌরবের বা উপেক্ষার কথা নয় ।

কৌতুক-প্রিয়তা বাঙালীর মজ্জাগত, রঙ্গে রসে, চটুল বাক্‌ভঙ্গিতে, তির্যক কটাক্ষে, এমনকি স্থূল ভাঁড়ামী করেও বাঙালী তার মানস-ধর্মের এই বিশিষ্টতাটিকে যেমন বরাবর প্রকাশ করে এসেছে, তেমনি এই বিশেষ দৃষ্টিতে ও ভঙ্গিতে আলোচ্য বিষয়টিও তীক্ষ্ণভাবে অথচ মনোরম ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে । পুরানো সাহিত্যের ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক সাহিত্যের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যরথী ও 'সিরিয়াস'

ব্যক্তিগুও ব্যঙ্গ ও কৌতুকের অস্ত্রকে খুবই সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন । বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসেও শুরু থেকেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ পত্রিকার অভাব হয় নি । ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত 'বিদূষক' (১২৭৭), পরিচালক সুরেন্দ্রমোহন মজুমদারের 'রসতরঙ্গ' (১২৭৮), শ্রী দুর্গাদাস ধর কর্তৃক প্রচারিত 'হরবোলা ভাঁড়' (১২৮০), ভূতপূর্ব-সম্পাদক শ্রী হরি সিংহের 'বসন্তক' (১২৮০), শ্রী দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজলিস' (১২৯৭) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি দেশের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও আনুষঙ্গিক নানা ঘটনা এবং ব্যক্তি-জীবন প্রভৃতিকে নিয়ে 'মজা' করেছিল । তাদের গদ্য-পদ্যে লেখা এই সকল চিত্রে ও চরিত্রে —"বর্তমান মানদণ্ডে মাঝে মাঝে হয়ত কিছু স্থূলতা ও অশ্লীলতাও দেখা যাবে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় । এমন নির্মল হাস্যরসের পত্রিকা কমই দেখা যায় । রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, মায় ব্যক্তিগত কুৎসা— সবই আছে, কিন্তু রচনার গুণে ব্যক্তি-বিশেষের মনে জ্বালা ধরায় নি , হাসিয়েছে সকলকে ।" এগুলি আসলে —"অসাধারণদের জন্য নয়, বিদ্বানদের জন্যও আসরে নামেনি, এটি সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই ।"[৭৩] এগুলির কোনটিতেই সম্পাদক ও লেখকদের নাম ছিল না, লেখার সঙ্গে চিত্রও ব্যবহৃত হয়েছে ।

বিংশ শতাব্দীতেও শ্রী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পকেটবুক সাইজের 'বিদূষক' (১৩২৭), 'দাদাঠাকুর' হিসাবে পরিচিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের 'বিদূষক' (১৩২৯), শ্রী মন্মথমোহন বসু ও শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারের যৌথ সম্পাদনায় 'মজলিস' (১৩২৯) এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সাহচর্য-ধন্য অসাময়িক পত্রিকা 'বেপরোয়া' (১৩২৯) প্রভৃতিও এই ধারায় কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল । দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-পার্টি, কংগ্রেসের রাজনীতি, পুলিশের অত্যাচার, ধর্মধ্বজী ও ধর্ম-ত্যাগীদের স্বরূপ, কোলকাতার বিচিত্র জীবন ও সমাজ, নারী-প্রগতি, রবীন্দ্রনাথ ও নতুন লেখকদের রচনা, নিজেকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা প্রভৃতি নিয়েও দমফাটা হাসি ও অন্তরজ্বলুনি কটাক্ষ ছুটিয়ে বাংলাদেশকে মাৎ করে রেখেছিল । এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তো ছিলেন যথার্থ 'বিদূষক', 'শনিবারের চিঠি' উদ্ভূত হয়েছিল ১৩৩১-এ । এই পত্রিকাটির প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬-এর গোড়ার দিকে 'মহাকাল' এবং শেষের দিকে 'রবিবারের লাঠি' । অক্রান্ত তরুণ লেখকেরাই এই পত্রিকা দুটির উদ্ভাবক, পরিচালক ও লেখক । 'শনিবারের চিঠি'র 'কার্বন-কপি' হিসাবে নিজেদের দেখিয়ে 'চিঠি'কে উপহসিত, অপদস্থ ও বিধ্বস্ত করতে চাইলেও 'শনিবারের চিঠি'র সরসতা, সত্য-নিষ্ঠা ও সাধনা এঁদের ছিল না, তাই এদের পরমায়ুও

তিন মাসের অধিক হয় নি । সমধূপ প্রয়াস নিয়ে 'ঘসন্তিকা' কিছু সোরগোল তুলতে চাইলেও রুচি, বক্তব্য ও আদর্শনিষ্ঠায় এটিও 'শনিবারের চিঠি'র কাছাকাছি আসতে পারে নি । হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শিবিজাকুমার বসু প্রমুখ প্রবীন সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকায় অংশ নিলেও আধুনিক লেখক সমাজেও পত্রিকাটি আদৃত হতে পারে নি । শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই পত্রিকাটিকে "শনিবারের চিঠির তুলনায় অনেক ভোলো আর হালকা" বলে মন্তব্য করে বুদ্ধদেব বাবুর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছিলেন — যেখানে বুদ্ধদেব বলেছিলেন — "শনিবারের চিঠির চাইতে 'ঘসন্তিকা' ঢের নিকৃষ্ট ধরণের কাগজ হয়েছে, 'শনিবারের চিঠি' আর যাই হোক, সিনসিয়ার, ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে । কিন্তু 'ঘসন্তিকা'র এই গায়ে-পড়ে ঝগড়া করতে আসার প্রবৃত্তিটা অতি জঘন্য । ... তার ওপর আগাগোড়া ওদের পেট্রোনাইজিং অ্যাটিটিউড্‌- টাই সবচেয়ে অসহ্য । আমাদের যেন অত্যন্ত কৃপার চোখে দেখে, এর চেয়ে 'শনিবারের চিঠি'র সোর্দ-এনমিটি অনেক ভালো, অনেক সুসহ ।" [৭৪]

'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য ও ভূমিকা-সমন্বিত কার্যক্রম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতেই । নিতান্ত একটি ব্যঙ্গ-ব্যঙ্গ পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয়ে সে যেমন এই ধারাতেও বিশিষ্টতা দেখাতে পেরেছিল এবং ব্যঙ্গ-পত্রিকা হিসাবে ইতিহাসে নিজের স্থানটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, তেমনি কিছু দিনের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধির মুহূর্তেও সে যোগ্য ভূমিকা সম্পাদন করতে পেরেছিল । এটা ঠিক যে, 'শনিবারের চিঠি'র দৃষ্টিভঙ্গিতে রক্ষণশীল মনোভাব প্রকট ছিল, তার কার্যক্রমেও প্রগতি-বিরোধিতা উগ্র রূপেই দেখা দিয়েছিল । রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির মত সেও অগ্রগতির ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল । কিন্তু পত্রিকাটির উদ্দেশ্যকে ঠিকমত জানলে তার ভূমিকার অশালীন ও অসংযত আচরণকেও কিছু সমর্থন না জানিয়ে পারা যাবে না । আধুনিকতার নামে 'কল্লোল'- গোষ্ঠীর অনাচার, ব্যভিচার ও বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের মহারথীদের দ্বারস্থ হয়েছিল, নিজেও সাধ্যমত সেগুলির প্রতিকার কামনায় নিজেদের চিন্তা ও ক্ষমতা অনুসারে শেষ পর্যন্ত প্রায় একাই মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল । সাহিত্যের ও সমাজের শুচিতা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে 'সাহিত্য'- সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মত 'অভিভাবক' সাজারও চেষ্টা সে করেছিল । তাঁদের যৌবনোচিত উম্মাদনা সৃষ্টির সহজ ও স্বাভাবিক পথ না পেয়ে বিকৃত পন্থাতেই নিজেদের আন্তরিক বিশ্বাসকে রূপায়িত করতে চেয়েছিল । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য নিয়ে দলীয় 'কোটারি' এবং গুরু-সদৃশ মোহিতলালের

ব্যক্তিগত বিশ্বাসকেও অস্বীকার বা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি' বাংলার যুগধর্মকে এবং তরুণ লেখকদের রক্ষণ ও পরিপোষণের কর্তব্যকে আন্তরিকভাবে স্বীকার ও পালন করতে দ্বিধা করে নি। অবশ্য শেষ পর্যন্তও আধুনিক কবিতার বিশিষ্টতাকে 'শনিবারের চিঠি' যে স্বীকৃতি দিতে পারে নি, তার কারণও যতটা নিজেদের দুর্বলতায়, প্রায় ততটাই এই বিশিষ্ট প্রবণতাটির প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। আন্তর সত্য ও সদর্থক ভূমিকা না থাকলে পত্রিকাটির পক্ষে এতদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। 'শনিবারের চিঠি'র কৃতিত্ব যেমন তার বিরোধী ভূমিকায়, তেমনি তার বন্ধুত্বপূর্ণ আনুকূল্যেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ডঃ ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য — "কল্লোল যুগে সাহিত্যের রথ যে দুটি চাকার পরে ভর করে এগিয়েছিল, তার একটি পদ গঠিত হয়েছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা'র-নির্মাণ-শালায়, ... অন্য পদ ছিল 'শনিবারের চিঠি' আর 'বঙ্গশ্রী' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকায়। ... প্রত্যেক সংঘটনেরই নাকি সমশক্তি সম্পন্ন বিপরীত প্রতি-ঘটনা রয়েছে, ... আর তাতেই নাকি বিশ্ব নিয়মের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে। 'কল্লোল'-যুগে সেই প্রতি-ঘটনা, তথা রথযাত্রার সেই দ্বিতীয় চক্রপদের ভূমিকা খ্যাত 'শনিবারের চিঠি'র। ... 'কল্লোল'-দলের অতিচারে যেমন, 'শনিবারের চিঠি'র অত্যুৎসাহী প্রতিরোধেও তেমনি এক অশান্ত-নগ্নের যৌবন-স্বভাবই জীবনের দুই পরস্পর বিপরীত কোটী থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল। ... 'কল্লোল' বনাম 'কল্লোলেতর' সম্প্রদায়ের তাৎক্ষণিক ইতিহাসের সার্থক সাহিত্যিক ফলশ্রুতি সন্ধান করতে হবে এই স্বভাব-নিয়ম ধর্মের পটভূমিতেই।[৭৫] শুধু তাই নয়—'বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ঝড়ের আঁধি কেটে গিয়ে অনেকটা পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় দুপক্ষের যুযুধানেরা অনেকেই আবার একত্র মিলিত হয়েছিলেন নবযুগ-জীবনের অনুধ্যানের সাধনায়" — সেকথা বলতেও ডঃ চৌধুরী দ্বিধা করেন নি। 'শনিবারের চিঠি'তেও যে শেষ পর্যন্ত যুগের সৃষ্টি-শীল ফসল ফলেছিল, এবং 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল — তার কথাও ভূদেববাবু স্মরণ করেছিলেন। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র মূল্যায়ণে সংস্কার-মুক্তি ও সহনশীলতা দাবী না করলে পত্রিকাটির প্রতি অবিচারই হবে।

গ. রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোক্তা শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন —"জীবনের সকল

ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বোগোসিটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম" করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'শনিবারের চিঠি' আবির্ভূত হয়েছিল[৭৬] শ্রী সজনীকান্ত দাস অবশ্য আরও স্পষ্ট করে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভবের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "রাজ্য-রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাসের প্রবর্তিত 'স্বরাজ্য-পলিটিক্স'কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করাই 'প্রবাসী'-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল" । [৭৭] 'শনিবারের চিঠি'র গোড়ার দিকের সূচীপত্র পরীক্ষা করলেও সজনীকান্তের অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় । এর পরে 'পলিটিক্স'এর ক্ষেত্র সাহিত্য অধিকার করলেও কিন্তু রাজ্য-রাজনীতির আলোচনা বাদ পড়ে নি । আরও পরে, পত্রিকাটির মাসিক জীবনে — যখন পত্রিকাটি আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক' অভিযানের 'অভিনব উদ্দেশ্য' গ্রহণ করেছিল, তখনও — রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-জাত ক্রিয়া-কলাপ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল । আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে এঁদের অভিযোগের মূলেও ছিল প্রধানতঃ এই চিন্তাজাত দৃষ্টিকোণ । আরও পরে পত্রিকাটি সাহিত্য ক্ষেত্রের সঙ্গেই সমান গুরুত্ব দিয়ে যুগের প্রকৃতিটিকে পর্যালোচনা করেছিল, এবং যুগধর্মের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছিল । বিশেষ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা না তুলেও তারই সূত্র ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের সমরোত্তীর্ণ কালে পরিবেশের প্রভাবকে যেমন সাহিত্য উপেক্ষা করতে পারে নি, সে সময়ের সাময়িক পত্রিকাগুলিও সেই পরিপ্রেক্ষিতটিকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয় নি, তার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম যাই-ই থাকুক না কেন । বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি' তো যুগ-প্রভাবকেই বহন করার কৃতিত্ব দাবি করেছিল । সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র মানসিকতা ও ভূমিকাটিকে ঠিকমত বুঝতে গেলে এবং আধুনিক সাহিত্যের উন্মেষ ও ক্রম-পরিণতির সূত্রটিকে চিনতে গেলে তৎকালীন ইতিহাসটিকে সংক্ষেপে স্মরণ করা দরকার ।

"ভারতে আধুনিক রাষ্ট্র-চিন্তার সূত্রপাত ঊনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাবেই হয়েছিল । ... এ দেশে ইংরেজ শাসনের সুফল এই যে, শতধা-বিভক্ত একটি মধ্যযুগীয় দেশকে তারা আধুনিক প্রশাসনে শুধু যুক্তই করে নি, উপরন্তু এদেশবাসীর মনে পরোক্ষে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চারেও সহায়ক হয়েছিল । কিন্তু বিদেশী শাসনের কুফল ঘটেছিল যে, বিদেশী শাসনের বিরোধিতা আর পাশ্চাত্ত্য-বিদ্বেষ ও আধুনিকতার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে ।"[৭৮] গবেষকের এই মন্তব্য থেকে ঊনিশ শতকের বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্টতা যেমন বোঝা যায়, তেমনি বিশ শতকে বাঙালীর চিন্তাধারা-জাত স্বাতন্ত্র্য ও ইঙ্গিত-প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতপক্ষে ঊনিশ শতকে রাষ্ট্রীয় চেতনাটি ঠিকমত গড়ে ওঠে

নি, বরং দেখা দিয়েছিল-তার সমন্বিত দার্শনিক প্রত্যয় । ইতিহাস-কার বলেন — এ সময়ে "ভারতের জাতীয়তাবোধ দুটি সমান্তরাল ধারায় গড়ে ওঠে । প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন এবং পরে ইংরেজের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত আধা-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ক্রমে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে"। ৭৯ এ সময়ে শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনৈতিক অনুশীলন সমিতিতে আগ্রহী থাকলেও এমন কি এই শতকের শেষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলেও প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ শুরু হয়েছিল বিশ শতকের গোড়া থেকেই । উনিশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের রাজনৈতিক প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে ।

বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে এক অভূত-পূর্ব জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হলেও, এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ ধূমায়িত হতে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতি-নিধিত্ব নিয়েই মাথা ঘামানো হত বেশি । কিন্তু এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী রাজনীতিকদের গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ও রাজনীতিতে চরমপন্থী আদর্শের সূচনা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে তার চিরাচরিত আপোষ-মূলক পথ থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল । ঐতিহাসিকেরা লক্ষ করেছিলেন —

> "Bengalis had enjoyed power in the nationalist movement for too long to be willing to abdicate on request. Nor were they willing to have an outsider dictate the form and content of their provincial politics." ৮০

কংগ্রেসকে একটা সত্যকারের গণতান্ত্রিক সংগঠনে রূপ দিতে শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল প্রশ্ন তুলেছিলেন —

> "Is the ideal of the Indian National Congress to be an essentially democratic ideal, or is it to work for the replacement of the present white and foreign bureaucracy by a brown one composed of home-materials ? " ৮১

গান্ধীজীর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিরুদ্ধাচরণ করে আন্দোলনে একটা ইতিবাচক রূপ দেবার প্রস্তাব করে তিনি বলেছিলেন — নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সাহায্যে দেশে একটা সমান্তরাল শাসন-কাঠামো তৈরী করা হোক । 'নিউ ইন্ডিয়া,' 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করে বিপিনচন্দ্র স্বদেশী সমাজের আদর্শ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সংগ্রামবাদী পন্থার ওপর জোর দিয়ে বাংলা দেশে এক নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র গড়ে তুলতে চান । এই বিশিষ্ট প্রবণতা ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলী লক্ষ করেই ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন —

> "The year 1919 may be looked-upon as an annus mirabilis which marked a definite stage in the history of India's struggle for freedom."[৮২]

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, মন্টেগু চেমসফোর্ডের শাসন-সংস্কার বিল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ভারতে যে প্রগতিবাদী শক্তি দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, এবং রাজনীতির হাল ছেড়ে রাজা-রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীরা নিজ হাতে নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রটিকেই অনেকখানি পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন । ১৯২০ তে গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেন এবং নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয় । ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে, কিন্তু ১৯২২-এ চৌরীচেরা হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী সেই আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নিলে দেশে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয় । গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় পরাস্ত হয় । ফলে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের ভিতরেই 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন, মতিলাল নেহেরু লালা লাজপত রায় প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারাও এতে সায় দেন । পরে একটা আপোষও হয় এবং চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । এই সময়কালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসানে তাঁর ওপর কংগ্রেসের দায়িত্ব অর্পিত হয় । চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল-রাজনীতি অল্প সময়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব বামপন্থী ও মুসলিম জনগণের আস্থা অর্জন করা ও কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা । এ সবের ফলেই তাঁর পক্ষে বৃটিশদের দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল দ্বৈত শাসন প্রস্তাবকে অচল করা সম্ভব হয়েছিল ।

'শনিবারের চিঠি' আবির্ভূত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে । চিত্তরঞ্জন তখন 'স্বরাজ্য' রাজনীতি করছিলেন । তাঁর কাউন্সিলে অংশ গ্রহণের পিছনে যুক্তি ছিল দুই রকমের — "একটি ধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করে বাধা দিয়ে তাকে বিকল করে দেওয়া, এবং অপর পন্থাটি ছিল গঠনমূলক, অর্থাৎ পল্লী সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস।" তিনি নিজেও উল্লেখ করেছিলেন —

> "Reformed Councils are really a mask which the bureaucracy has put on. I conceive it to be our clear duty to tear this mask from off their face." [৮৩]

স্বরাজ্য-রাজনীতি সে সময়ে প্রভূত সাফল্য লাভ করলেও রাজ্য কংগ্রেসেরই একাংশ যেহেতু একে সমর্থন করে নি, এবং স্বয়ং গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে ছিলেন, গান্ধীভক্ত 'প্রবাসী'-গোষ্ঠী এবং তারই ওকালতি নিয়ে অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে রঙ্গ-ব্যঙ্গের ফুলঝুরি ফোটাতে লেগেছিলেন । অথচ তাঁদের বক্তব্যে ও বিরোধিতার মানসিকতায় কী কংগ্রেসী-রাজনীতি, কী স্বরাজ্য-রাজনীতি, — কোনটিকেই বোঝার আগ্রহ দেখা যায় নি । সুভাষ চন্দ্র সে সময়ে তরুণ মাত্র, কংগ্রেসেরই রাজ্য-সম্মেলনের 'ভলান্টিয়ার-ইন-চার্জ', রাজনীতির সঙ্গে তখনও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব স্পষ্ট ও নিবিড় ছিল না । অথচ তাঁকে 'গড্' বাক্স-নাম দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল । পরবর্তীকালে শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী এ সম্পর্কে লিখেছিলেন —

> "The first expression of Bose's militarism was seen at the session of the Indian National Congress in Calcutta in 1928. For it Bose organised a volunteer corps in uniform, its officers being even provided, as far as I remember, with steel-chain epaulettes. Bose designated himself as its General-officer-Commanding, G.O.C for short... Mahatma Gandhi, being a sincere pacifist vowed to non-violence... described the Calcutta session of the Congress as a Bertram Mills circus, which caused great indignation among the Bengalis." [৮৪]

অথচ এই সুভাষচন্দ্রকেই পরে 'নেতাজী' রূপে স্বীকার করে নিতে এঁদের অসুবিধে হয় নি, কারণ তাতে মহাত্মা গান্ধীর সায় ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশকেও মহাত্মাজীর সমর্থনের পরে এঁরা 'দেশবন্ধু' রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। আসলে রাজনীতি নয়, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবোধই তাঁদের মানসিকতায় ক্রিয়াশীল ছিল। এমন কি 'শনিবারের চিঠি'র শেষদিকে যখন ব্যাপকভাবে গান্ধীচর্চা করা হয়েছিল, সেখানেও গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধর্ম অপেক্ষা তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল গান্ধী-শিষ্য নির্মলকুমার বসুকে দিয়ে। সজনীকান্ত নিজেও স্বীকার করেছিলেন — "মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া সেই ১৯২০, সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮, ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পলিটিক্স্ অনেক হইয়াছে। আমি তাহার কোনটিই কখনও অবলম্বন করিতে পারি নাই। তাহাতে ভারতীয় ঋষিদের সর্বশেষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি তখন হইতেই তাঁহার প্রতি এক নৈতিক ও আত্মিক আকর্ষণ অনুভব করিতাম।"[৮৫] 'দেশবন্ধু' ও 'নেতাজী' সম্পর্কেও উল্লেখের মধ্যে তাঁদের রাজনীতির কথা বিন্দু-বিসর্গও ছিল না। এমন কি, যে সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে ও তাঁদের বীর্যপূর্ণ আত্মোৎসর্গে ব্যর্থ করার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারলেও তাঁদের প্রতি কোন আকর্ষণ বা কৌতূহল যে এঁরা অনুভব করেছিলেন, তার কোনই প্রমাণ নেই। আর বামপন্থীদের নিয়ে তো কেবল কৌতুক করা হয়েছিল, গালি দেওয়া হয়েছিল। আসলে রাজনীতিটাই এঁদের মধ্যে ছিল না। এঁরা বিভিন্ন উপলক্ষ নিয়ে মজা করতো মাত্র — বলে তাঁদেরই সহযোগী মন্তব্য করেছিলেন।[৮৬]

তবে কেবল হালকা মেজাজে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও ঘটনাসমূহকে নিয়ে ব্যঙ্গ-ব্যর্থ করাই নয়, কতকগুলি নিপীড়ন-মূলক ঘটনাবলী নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদও করেছিল। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব, দেশব্যাপী ব্যাপক নিপীড়ন, হিজলীর বন্দী নিবাসে রাজবন্দীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ, প্রেস্ অ্যাক্ট্ চালু করা, গোল-টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধীর অনশন সত্যাগ্রহ প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা-বলী নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় ও কার্টুন চিত্রে। রাজনীতির আদর্শ নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও বৃটিশের দণ্ডনীতির সমালোচনায় 'শনিবারের চিঠি' দ্বিধা করে নি, এবং এর জন্য আদালতে সোপর্দ হতেও হয়েছে কয়েকবার। দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনে আধুনিক লেখকদের কন্টিনেন্টাল্ সাহিত্যের আবর কেটে যৌন-নৃত্যের অযৌক্তিক ও দেশ-কল্যাণ ইচ্ছার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব ও কার্য-ক্রমকে এঁরা বরদাস্ত করতে পারেন নি, এই দুঃসময়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সাড়ম্বর অনুষ্ঠান ও

রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্বন্ধেও ওঁরা উপেক্ষা করতে পারেন নি, রবীন্দ্র-বিরোধিতার এটাও একটা কারণ বা উপলক্ষ ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই এও দেখে অবাক হতে হয় যে, উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ বা মানব ও দেশপ্রীতির জন্যই হোক, আর বিশ শতকের যুগলক্ষণের জন্যই হোক, — ওঁরা যেমন বৃটিশের বর্বরোচিত নিপীড়নের প্রতিবাদ করেছিলেন, সেই সময়ে একই মানসিকতা নিয়ে কংগ্রেসের নরমনীতির বিরোধিতা করে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিক তরুণেরা যে আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নিয়েছিলেন, সে দিকটি ওঁরা উপেক্ষা করলেন কিভাবে। অথচ ঘটনার দিক থেকেও ১৯০৮ থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকিদের মত সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতির কার্যাবলী উপেক্ষা করার মত ছিল না। পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে ১৯৩০ সালে ৩৬টি, ১৯৩১-এ ৬৫টি, ১৯৩২-এ ১৪টি এবং ১৯৩৩-এ ৪৩টি রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দল গঠন, দেশত্যাগ ও দেশের বাইরে থেকে মুক্তি-আন্দোলন গড়ে তোলা প্রভৃতি উপেক্ষণীয় ছিল না। এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলেছিলেন —

> "Economic deprivation, frustrated ambition, and injured pride made the lower-class bhadralok ready recruits for radical political action... The bravery the young terrorists displayed in their assassination bids and in their court trials was of great Psychological importance to the bhadralok as a riposte to the hated British jibes about babu verbosity and un-manliness." ৮৭

নজরুলের সাম্যবাদী বিদ্রোহী-সত্তাকে এই পর্বেও চর্চা করার সময় ওঁদের ইতিহাসের অমোঘ পরিবর্তন ও নিগূঢ় কার্য-পরম্পরা মনে পড়ে নি। কেমন করে কংগ্রেসের ভেতরেই উগ্রপন্থীদের সমাবেশ হয়, তাশখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ভারতে বামপন্থী কার্যক্রমের নির্দেশ লেনিনের সমর্থন লাভ করে, মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে এ দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠন হয়, এবং মীরাট-ষড়যন্ত্র-মামলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন একটা সুস্পষ্ট মোড় নিতে উদ্যত হয়,— সে সমস্তই ওঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বা উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ 'লাঙল', 'গণবাণী', 'জাগরণ' প্রভৃতি পত্রিকার পরেও 'ধূমকেতু',

'শ্রমজীবী', 'ফরোয়ার্ড', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি পত্রিকায় এই আন্দোলনের তাৎপর্য-ব্যঞ্জক প্রচার ভালই ছিল, এবং দেশে সেই কার্যক্রমগুলির প্রভাবও কম ছিল না ।

এই সময়ে এঁদের শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিল —"শূন্যতা তখন চারিদিকেই । মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ব্যাপকতা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পায়ের তলার মাটি নড়াইয়া দিয়াছে । ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতার শপথ লওয়া হইয়া গিয়াছে, ইহা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । পুরা আড়াই শত বৎসরের পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ সংস্পর্শের ফলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইমারত বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে ও চেষ্টায় তাহাতে যে চিড় খাইয়াছিল, এইবার তাহা ফাটলরূপে দেখা দিল । এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ভূমিকম্প বাংলা সাহিত্যে বিজাতীয় ধারাকেও বিপর্যস্ত ও স্তব্ধ করিয়া দিল । সাহিত্যে আত্মনিবেদনের পরে সেই সর্ব প্রথম আমার মনে হইল, আমাদের প্রয়োজন ফুরাইল ।"[২৮] অর্থাৎ ঊনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা নিয়েই এঁরা রাষ্ট্রনৈতিক ও সাহিত্য-ঘটিত আন্দোলনের বিচার করতে চেয়েছিলেন । এবং সেই কারণেই সম্ভবতঃ কেবল বিশিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র ও ধারাকে এঁরা যেমন বুঝতে পারেন নি, তেমনি বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলেই যে আমাদের শিক্ষিত তরুণদের মনে আদর্শ-বিপর্যয় ঘটেছিল, সেই সত্যটিকেও বুঝতে চান নি । অথচ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর অর্থনৈতিক সংকট দিন দিন তীব্রতর হচ্ছিল । ইংরেজ সাম্রাজ্য-বিস্তারের অনুগামী হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তার যে অবাধ চাকুরীর সুযোগ ছিল, তা ক্রমেই সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছিল । মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার করতে চাইছিলেন ইংরেজ সরকার তখনকার শিক্ষিত তরুণ হিন্দুকে । অন্যদিকে, কৃষকের স্বার্থরক্ষার সুযোগগুলিকেও নানাভাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের কুক্ষিগত করে তুলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করে তাঁকে শহরমুখী করে তুলেছিলেন তাঁরা । যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ভাঙন গোটা বাংলা দেশকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল । শহরের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু মজুরি যায় কমে, বেকারত্বের জ্বালায় শিক্ষিত যুবক নৈরাশ্য বোধের ব্যাধিতে কবলিত হয়, দেখা দেয় নানা ধরণের মানসিক বিপর্যয় — আদর্শ ও মূল্যবোধে অনাস্থা, ভাঙনের নেশা, স্পর্ধিত দর্প, যৌনতার ব্যভিচারে জীবন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি । এরই মধ্যে অবশ্য রুষ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় তাঁদের একাংশে জেগে ওঠে বিকল্প সমাজ-চেতনা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ । দেশে প্রচলিত বামপন্থী পত্রিকাগুলি এবং কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ তাঁদের পথ সংকেত করে ।

ইতিহাসের এই সংকেত 'শনিবারের চিঠি' সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি বলেই আধুনিক সাহিত্যের বিরোধিতায় তাঁরা ঐতিহ্য-অস্বীকৃতি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ, অশক্তের আস্ফালন ও তরুণদের মানসিক বিকৃতি বলে কেবল গালিই দিয়েছিলেন, এটিকে "কালগত-পরিবর্তন এবং অবশ্যম্ভাবী"[৮৬] বলে বুঝতে পারেন নি, এবং চানও নি । এইখানেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা । 'শনিবারের চিঠি'র শেষ পর্যায়ে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর আলোচনায় দেশের দুর্গতি অনুভূত হয়েছিল, লেখকদের প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন প্রতিভাও যে অর্থনৈতিক দুর্বিপাকে অকালে অস্ফুট থেকেই ঝরে যায়, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর চাপে তাঁদের মানসিকতা সরল ও সুস্থতা লাভ করতে পারে না — এসব চিন্তা জেগেছিল, এবং তাঁরা গান্ধীবাদী দৃষ্টিতে ও জাতীয়তাবাদের নিরীখেই সেগুলির সমাধানের পথও খুঁজেছিলেন । কিন্তু সভ্যতার অভিশাপ, সাম্রাজ্যবাদীর লোভ, আন্তর্জাতিক প্রভাব প্রভৃতি আধুনিক জীবনের সত্যকে যে পুরাতন প্রকোষ্ঠে ফেরানো সম্ভব নয়, সেকথা তাঁরা বুঝতে চান নি । যুগের সন্তান হয়েও এবং ব্যক্তিগত জীবনে যুগযন্ত্রণাকে সহ্য করেও সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'কে যুগের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন নি । কথাসাহিত্যের চর্চায় আধুনিক মননকে সহ্য করলেও, এমন কি প্রশ্রয় দিলেও — তাঁর মানসিকতার এই সীমাবদ্ধতা ও সংস্কার ঘোচা সম্ভব ছিল না ।

অবশ্য সামাজিক ক্ষেত্রে গঠনধর্মী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে 'শনিবারের চিঠি' সে সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুগ-কর্তব্য পালন করেছিল । বৃটিশ রাজশক্তি নিজেদের স্বার্থে ভেদ-নীতি গ্রহণ করে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, এবং তার ভয়াবহ সর্বনাশা ফলও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছিল । ঐতিহাসিক লিখেছেন —

> "The fundamental consideration that kept them (Hindu and Muslim) apart in the political evolution of the twentieth century was the disparity between the two communities in point of number and educational progress... The educational back-wardness of the Muslims deprived them of their due and legitimate share of high and responsible posts in the Government of the country." [১০]

সুচতুর ইংরেজের কৌশলে এর ফলে দেখা গেল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈরিতা । একজন ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছিলেন —"শিক্ষিত মুসলমানদের এক প্রভাবশালী অংশ একথাও মনে করেন, নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শাসনতন্ত্র হিন্দু-প্রভাবমুক্ত হয়ে মুসলমানদের উন্নতির সহায়ক হবে । তাই তাঁরা স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নি এবং এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই মনে করেন ।"[১১] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের খাতিরে গান্ধীজী ভারতীয় মুসলমানদের 'খিলাফৎ' আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গেই অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন । ১৯১৯ থেকে ১৯২২ - এই সময় পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক মোটের ওপর ভালই ছিল । কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলিম-প্যাক্টের মধ্য দিয়ে রাজ্য-রাজনীতির আন্দোলনকে পরিচালনা করার সঙ্কল্প হিন্দু সংবাদপত্রের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়, এবং স্বরাজ্য পার্টি মুসলিম-সমর্থন হারিয়ে ফেলে । তাছাড়া স্বরাজ্য পার্টির দ্বারা উত্যক্ত হয়ে —

> "The District Officers were instructed to throw their influence behind whichever local Muslim association was prepared to support the Government ." [১২]

ধুরন্ধর বৃটিশ-রাজ 'সাইমন কমিশন' রিপোর্টের মধ্য দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগান । ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ — দীর্ঘ আলোচনার ভাণ করে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করলেন ।

> "These were assaults on the super-structure of Hindu bhadralok political power. The legislation to relieve peasant indebtedness threatened the substructure of their economic power." ১৩

এর ফলে পৌনপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতবর্ষ কলঙ্কিত হয়েছে, জাতীয় আন্দোলন ব্যতিপ্রস্ত হয়েছে । অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে । এই জটিলতা ও বিরোধ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করে । উর্দু ভাষার প্রচলন, মুসলিম সাহিত্য প্রচার, মুসলিম পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির ওপর জবরদস্তিমূলক জোর দিয়ে

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিরোধকে টেনে আনা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বিতর্ক, মুসলিম পত্রিকাগুলির অযথা জিদ এবং উর্দুমিশ্র ভাষায় সাহিত্য রচনা দেশে একটা বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যাগুলি শনিবারের চিঠিতে বারবার আলোচিত হয়েছিল। গোড়ার দিকে কিছুটা মুসলিম-বিরুদ্ধ ভাব থাকলেও শেষে এই দুষ্ট ব্যাধির সমাধানকল্পে এঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।

আরও একটি সামাজিক বিষবৃক্ষের উৎপাটনে শনিবারের চিঠি প্রথমাবধি চেষ্টা করেছিল। শ্রী সজনীকান্ত দাস লিখেছেন — "স্বদেশী আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর মেরুদন্ড শক্ত ছিল। ... বহু বহু শতাব্দীর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ঊনবিংশ শতকের বনস্পতিতুল্য সাধকদের সুবিপুল সাধনার উপর বাঙালীর ভবিষ্যতের যে ভিত্তি রচিত হইতেছিল, আকস্মিক বিশ্ব সংকটে তাহা নড়িয়া গেল, এবং ঝড়ের ঝাপটায় বিদেশ হইতে উড়িয়া-আসা কাঁটা গাছের উচ ডালের উপরে বাঙালী অবুধ্যের পুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জীবনের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল, ... ইহারই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম।"[১৪] অর্থাৎ সজনীকান্ত এখানে দুটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন। একটি, আমাদের জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ থেকে সরে গিয়ে তরুণ লেখকেরা সেসময় ইওরোপীয় উপ-আদর্শের অনুকরণ করে সমাজ-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অনাচার ও যথেচ্ছাচারের স্রোত বইয়ে দিচ্ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির মূল অভিযোগই ছিল এইটি। এঁরা সমাজ ও সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নিয়ে সমাজ-কল্যাণের আদর্শেই এই সাহিত্যের বিচার করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের এই যথেচ্ছাচার যে সমাজে সমাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ বিপদের কারণ হয়েছিল, তা এঁদের আলোচনায় এবং পাঠক-দের চিঠিপত্রে আলোচিত হয়েছিল। শনিবারের চিঠির সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় এর বিস্তারিত পরিচয় আছে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দুষ্ট ক্ষত এসেছিল গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের কাছ থেকেও। সজনীকান্ত উল্লেখ করেছেন —"ভাবপ্রবণ বাঙালীর চরিত্রগত সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দৈবের দোহাই পাড়িয়া একদল লোক ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ভুয়া গণৎকার ও ভুয়া ধর্মগুরুতে দেশ ছাইয়া গেল। ... দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সস্তায় কিস্তি মারিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ। ... কিন্তু জীবনের সর্বঘটে তথাকথিত গুরু ও গণৎকারের প্রাধান্যের মধ্যে যে সাধারণ মানুষের কতখানি অসহায়তা ও পলায়নী মনোভাব লুকাইয়া আছে, কতখানি দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা ঘটিলে এই টক-নির্ভরশীলতা

জাতিকে পাইয়া বসে, তাহা প্রণিধান করিয়া আমি আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি উচ্চ সরকারী পদস্থেরাও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আকর্ষণে এই দুর্বলতার কবলে পড়িয়াছিলেন। ... শিষ্যের পক্ষে ভক্তির আতিশয্য ঘটিলেই যে পরমার্থ লাভ হয়, তাহা নয়, শিষ্যকে তাহার যাবতীয় আর্থিক উপার্জন, মায় স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত গুরুর চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, তবেই মুক্তি। চোখের সামনে অনেক সংসার ভাঙিতে দেখিলাম। পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় অনেক পুত্র পাগল হইল, অনেক সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়া দিলেন গুরু। .... এই ভুয়া আশ্রমগুলি দেশকে ঘুণ করিতেছে।" এই দুষ্ট ক্ষত নিবারণেও 'শনিবারের চিঠি' উল্লেখযোগ্য প্রয়াস করেছিল, যার জন্য তাকে মামলা-মোকর্দমায়ও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল বলে সজনীকান্ত উল্লেখ করেছেন। এই সকল নিবারণমূলক প্রয়াস ছাড়াও অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পতিতা-সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, পল্লী-উন্নয়ন, বন্যা ও মহামারীর মত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও দেশের কল্যাণমুখী কার্যক্রমের বিষয়েও 'শনিবারের চিঠি' বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে এই সকল অবদানের জন্যও 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকাটি বিশেষ মনোযোগপূর্ণ পর্যালোচনার দাবি রাখে। পত্রিকাটির ভূমিকা সঠিকভাবে নির্দেশ করার জন্যই এই সকল বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ করা দরকার ছিল, গালিগালাজের পরেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে।

গ্রন্থসূত্র

১. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ- ১৫৭

২. —————— -ঐ- পৃঃ- ৫০৭

৩. J.N.Sarkar : History of Bengal, Vol.II, P:-496

৪. —————— -do- P:-497

৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আধুনিক কবিতার ইতিহাস, সূচনা, পৃঃ- ১

৬. Pramatha Choudhury : Paper on the story in Bengali Literature, (1917)

৭. গোপাল ভৌমিক : সাহিত্য সমীক্ষা, পৃঃ- ৭-৮

৮. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পৃঃ- ১০-১১

৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ১

১০. —————— -ঐ- -ঐ- ১

১১. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : আধুনিক বাংলা কবিতা, ভূমিকা, পৃঃ- ৮

১২. বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্য চর্চা, পৃঃ- ১৩৬-৪০

১৩. —————— -ঐ পৃঃ- ১৪৭

১৪. ডঃ জীবেন্দু সিংহরায় : কল্লোলের কাল, পৃঃ- ১৩৬

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃঃ ৭২

১৬. B. Bose, : An Acre of Green Grass, P:-78

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, ৭২, ৭৮, ৮৩

১৮. G.S. Fraser : Modernity in Literature, The Modern writer and his World, P:-11.

১৯. W.H.Hudson : An Introduction to the Study of Literature, P:- 31.

২০. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : আধুনিক বাংলা কবিতা, ভূমিকা, পৃঃ- ৬-৮

২১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আধুনিক কবিতার ইতিহাস, (সূচনা) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত: আধুনিক বাংলা কবিতা, (ভূমিকা)— প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

২২. এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় —"ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির যুক্তি না তুলিয়াও, উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ হইতেই মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাসই দেশ-কাল-ধৃত মানব-ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে ।"— বাঙালীর ইতিহাস—আদি পর্ব (১ম খণ্ড), ডঃ নীহার রঞ্জন রায় , পৃঃ- ৫ ।

২৩. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : (ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত—ভূমিকা) ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ ও বাংলা সাহিত্য.

২৪. মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ ও কবি শ্রী মধুসূদন, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৫০

২৫. বিষ্ণু দে : মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, পৃঃ- ১৬

২৬. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ১৪২

২৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ- ৪২, ৬৪

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১

২৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ১৭৮

৩০. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা পৃঃ- ৩৩০-৩১

৩১. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ১০-১১

৩২. —————— -ঐ- পৃঃ- ১

৩৩. বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য চর্চা, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, পৃঃ- ১৩৬

৩৪. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে, বাংলা উপন্যাস, পৃঃ- ২৩৩, ২৩৫

৩৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ- ৫৩

৩৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, পৃঃ- ১৩৩-৩৪

৩৭. ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃঃ- ৬০

৩৮. অজিত দত্ত : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬২

৩৯. বুদ্ধদেব বসু — কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬১

৪০. বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, পৃঃ- ১৫০

৪১. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ- ৫৪-৬০, ৪র্থ খণ্ড

৪২. —————— -ঐ- পৃঃ- ১৫৪-৬৫ "

৪৩. রবীন্দ্রনাথের পত্র — চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, ৩৯ ও ১১৬ নং পত্র

৪৪. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, পৃঃ- ১২৩

৪৫. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ২৪৯

৪৬. —————— -ঐ- পৃঃ- ১৮৩

৪৭. —————— -ঐ- পৃঃ- ১৮৬

৪৮. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ১৮৮

৪৯. মোহিতলাল মজুমদার : সাহিত্য বিতান

৫০. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য
পৃঃ- ১২৭

৫১. ডঃ শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাস , পৃঃ- ১৫০

৫২. সজনী কান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড) , পৃঃ- ৩০৪

৫৩. ———— -ঐ- পৃঃ- ৩০৫

৫৪. সবুজপত্র, মুখপত্র, বৈশাখ, ১৩২১

৫৫. ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : নূতন ও পুরাতন

৫৬. প্রমথনাথ বিশী : বাংলার লেখক, প্রমথ চৌধুরী

৫৭. বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য চর্চা, সাহিত্য পত্র, পৃঃ- ৩৬-৩৭

৫৮. ডঃ গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,
পৃঃ- ১৭- ১৮

৫৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ২৪৯-৫০

৬০. বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য চর্চা, সাহিত্য পত্র, পৃঃ- ৩৭

৬১. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ১

৬২. জগদীশ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ভূমিকা

৬৩. ডঃ জীবেন্দু সিংহরায় : কল্লোলের কাল, পৃঃ- ১৩৩

৬৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য

৬৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, পৃঃ- ৮২

৬৬. সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ-১১৭- ১১৮

৬৭. ———— -ঐ- পৃঃ- ১৭০

৬৮. পবিত্র চট্টোপাধ্যায় : প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬১

৬৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ২৫৫-২৫৮

৭০. বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য চর্চা, সাহিত্য পত্র, পৃঃ- ৪১-৪২

৭১. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , ৪র্থখণ্ড, পৃঃ- ৩৫৫

৭২. ———— -ঐ- পৃঃ- ৩৫৭

৭৩. শ্রী কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'যষ্টি মধু' পত্রিকার 'ব্যঙ্গ পত্রিকা পরিচিতি' শীর্ষক
বিশেষ সংখ্যায় মন্তব্য ।

৭৪. শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, (১৩৬০) পৃঃ- ২৪৯-৫০

৭৫. ডঃ ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃঃ- ৬৬৬-৭০

৭৬. শনিবারের চিঠি — সজনী স্মরণ সংখ্যা, ১৩৬৮

৭৭. সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ১০২

৭৮. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ- ১৪

৭৯. ———— ঐ পৃঃ- ১৫

৮০. J.H.Broomfield : Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal, P:-147.

৮১. H.Mukherjee & U. Mukherjee : Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj, P:- 12.

৮২. R.C.Majumder : History of Freedom Movement in India,Vol.II, P:-1.

৮৩. N.N.Mitra : The Indian Annual Register, P:- 835.

৮৪. N.C.Chaudhury : The Continent of Circe, PP:-103-104.

৮৫. সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি, পৃঃ- ৮২

৮৬. গোপাল হালদার : শনিবারের চিঠি, সজনী স্মরণ সংখ্যা, ১৩৬৮

৮৭. J.H.Broomfield : Elite Conflict in a Pluval Society, Twentieth Century Bengal, P:-33.

87(a) -Do-

৮৮. সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ৩০২

৮৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ- ২৪৭-৪৯

৯০. R.C.Majumder : History of the Freedom Movement in India, Vol.II, P:-276.

৯১. অমলেন্দু দে : বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ- ২৫১

৯২. J.H. Broomfield : Elite Conflict in a Pluval Society : Twentieth Century Bengal, Vol.II,P:-272.

৯৩. ———— ঐ 287

৯৪. সজনীকান্ত দাস : আত্মস্মৃতি (অখণ্ড), পৃঃ- ২৫৭-৫৮

৯৫. ———— ঐ পৃঃ- ২৫৯-৬২